# যৌগিক চিকিৎসা ও দ্রব্যগুণ

শ্রীপ্রভাতরঞ্জন সরকার

# যৌগিক চিকিৎসা ও দ্রব্যগুণ

© আনন্দমার্গ প্রচারক সংঘ (কেন্দ্রীয়) কর্তৃক সর্বসত্ব সংরক্ষিত

রেজিষ্টার্ড অফিসার: আনন্দনগর, পোষ্ট-বাগলতা, জেলা-পুরুলিয়া, পশ্চিমবঙ্গ

যোগাযোগের ঠিকানা: ৫২৭, ভি. আই. পি. নগর, কলকাতা-১০০

প্রথম সংস্করণ:

আনন্দপূর্ণিমা, ১৯৫৮

নবম মুদ্রাঙ্কন: জানুয়ারী, ২০১৬

প্রকাশক:

আচার্য মন্ত্রেশ্বরানন্দ অবধূত (কেন্দ্রীয় প্রকাশন সচিব)
আনন্দমার্গ প্রচারক সংঘ ৫২৭, ভি. আই. পি. নগর কলকাতা-৭০০ ১০০, পশ্চিমবঙ্গ

মুদ্রাকর:

আচার্য অভিব্রতানন্দ অবধূত
আনন্দ প্রিন্টার্স ৩/১সি, মোহনবাগান লেন,
কলকাতা-৭০০ ০০৪

প্রাপ্তিস্থান: প্রভাত লাইব্রেরী

৬১, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৭০০ ০০৯

ISBN: 978-81-7252-312-1

মূল্য: ৫০ টাকা মাত্র

# ।। উৎসর্গ ।।

পরমপূজ্য মাতুলদেব ৺শরৎচন্দ্র বসু
মহাশয়ের পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশ্যে-

সেবকাধম
প্রভাত

# চরম নির্দেশ

“যে দু’ৰেলা নিয়মিতরূপে সাধনা করে, মৃত্যুকালে পরমপুরুষের কথা তার মনে জাগৰেই জাগৰে ও মুক্তি সে পাৰেই পাৰে । তাই প্রতিটি আনন্দমার্গীকে দু’ৰেলা সাধনা করতেই হবে - ইহাই পরম পুরুষের নির্দেশ। যম-নিয়ম ব্যতিরেকে সাধনা হয় না । তাই যম-নিয়ম মানাও পরম পুরুষেরই নির্দেশ । এই নির্দেশ অমান্য করার অর্থ হ’ল কোটি কোটি বৎসর পশুজীবনের ক্লেশে দগ্ধ হওয়া । কোন মানুষকেই যাতে সেই ক্লেশে দগ্ধ হতে না হয় , সবাই যাতে পরম পুরুষের স্নেহচ্ছায়ায় এসে শাশ্বতী শান্তি লাভ করে, তজ্জন্য সকল মানুষকে আনন্দমার্গের কল্যাণের পথে নিয়ে আসার চেষ্টা করা প্রতিটি আনন্দমার্গীর অবশ্য করণীয়। অন্যকে সৎপথের নির্দেশনা দেওয়া সাধনারই অঙ্গ।”

শ্রীশ্রীআনন্দমূর্ত্তি

# রোমান্ সংস্কৃত বর্ণমালা

বিভিন্ন ভাষার উষ্চারণ যথার্থ ভাবে প্রকাশ করবার জন্যে ও দ্রুত - লিখনের প্রয়োজনীয়তার কথা ভেবে নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে রোমান্ সংস্কৃত বর্ণমালা প্রবর্তিত হল :

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| অ | আ | ই | ঈ | উ | ঊ | ঋ | ৠ | ঌ | ৡ | এ | ঐ | ও | ঔ | অং | অঃ |
| अ | आ | इ | ई | उ | ऊ | ऋ | ॠ | ऌ | ॡ | ए | ऐ | ओ | औ | अं | अः |
| a | á | i | ii | u | ú | r | rr | lr | lrr | e | ae | o | ao | aḿ | ah |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ক | খ | গ | ঘ | ঙ | চ | ছ | জ | ঝ | ঞ |
| क | ख | ग | घ | ङ | च | छ | ज | झ | ञ |
| ka | kha | ga | gha | uṇa | ca | cha | ja | jha | iṇa |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ট | ঠ | ড | ঢ | ণ | ত | থ | দ | ধ | ন |
| ट | ठ | ड | ढ | ण | त | थ | द | ध | न |
| ťa | ťha | ďa | ďha | ńa | ta | tha | da | dha | na |

প ফ ৰ ভ ম

प फ ब भ म

Pa pha ba bha ma

য র ল ব

य र ल व

ya ra la va

শ ষ স হ ক্ষ

श ष स ह क्ष

sha śa sa ha kśa

অঁ জ্ঞ ঋষি ছায়া জ্ঞান সংস্কৃত ততোঽহং

अँ ज्ञ ऋषि छाया ज्ञान संस्कृत ततोऽहं

aṋ jiṋa rśi cháya jiṋána saḿskrta tato’haḿ

a á b c d d́ e g h i j k l m ḿ n

ń ṋ o p r s ś t t́ u ú v y

সমগ্র বিশ্বে বহুল প্রচারিত রোমকলিপির মাত্র ২৯ টি অক্ষরেই সংস্কৃত ভাষার উচ্চারণ যথাযথভাবে প্রকাশ করা সম্ভব। এতে যুক্তাক্ষরেরও ঝামেলা নেই। আরবী, ফারসী ও অন্যান্য কোন কোন ভাষার f , q , qh , z প্রভৃতি অক্ষরগুলোর প্রয়োজন আছে , সংস্কৃতের নেই।

শব্দের মধ্যে বা শেষে ' ড ' ও ঢ ' থাকলে যথাক্রমে ড় ওঢ় রূপে উচ্চারিত হয়, ' য় ' - এর মত তারাও কোন স্বতন্ত্র বর্ণ নয়। প্রয়োজন বোধে ও অসংস্কৃত শব্দ লিখবার জন্যে ŕ ও ŕha ব্যবহার করা যেতে পারে।

অসংস্কৃত শব্দ লিখবার প্রয়োজনে সংযোজিত আরো দশটি বর্ণ

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| क़ | ख़ | ज़ | ड़ | ढ़ | फ़ | य़ | ऩ | त् | अँ |
| क़ | ख़ | ज़ | ड़ | ढ़ | फ़ | य़ | ऩ | ৎ | अँ |
| qua | qhua | za | ŕa | ŕha | fa | ya | lra | t | aṉ |

# গ্রন্থকারের নিবেদন

চিকিৎসার উদ্দেশ্য শারীরিক ও মানসিক সুস্থতা বিধান। তাই এতে চিকিৎসা শাস্ত্রবিশেষের মর্যাদা রক্ষার প্রশ্নটা বড় নয়, বড় কথা হচ্ছে রোগীর কল্যাণ।

বাহ্যিক অথবা আভ্যন্তরীণ ঔষধ প্রয়োগের দ্বারা বিকারপ্রাপ্ত দেহযন্ত্রকে যেমন স্বাভাবিক অবস্থায় আনা যায়, ঠিক তেমনই যৌগিক আসন-মুদ্রাদির সাহায্যে অধিকতর নিরাপদ ও নিখুঁতভাবে দেহযন্ত্রের স্বাভাবিক কর্মদক্ষতা ফিরিয়ে আনা সম্ভব। প্রতিটি ব্যাধির যৌগিক চিকিৎসা পদ্ধতি সম্বন্ধে জনসাধারণকে অবহিত করাই এই পুস্তকের উদ্দেশ্য।

পুস্তকে বর্ণিত আসন-মুদ্রাদির অনুশীলন করে লোকে রোগমুক্ত হোক এটাই আমার উদ্দেশ্য। তবে

জনসাধারণকে অনুরোধ করি তাঁরা যেন আসন-মুদ্রাদির ব্যাপারে নিজেরা কোন ঝুঁকি না নিয়ে অভিজ্ঞ আচার্যদের পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করেন। আনন্দমার্গের আচার্যরা বিনা পারিশ্রমিকে তাঁদের সাহায্য করবার জন্য সর্বদাই প্রস্তুত থাকবেন। আসন, মুদ্রা, স্নান প্রভৃতির বিবরণ 'আনন্দমার্গে চর্যাচর্য' পুস্তকের তৃতীয় খণ্ডে বিস্তারিত দেওয়া হয়েছে। পাঠক প্রয়োজন বোধে পুস্তকটি দেখে নিতে পারবেন।।

আসন, মুদ্রার সঙ্গে সঙ্গে বিনা ব্যয়ে বা অল্প ব্যয়ে সহজলভ্য কিছু কিছু ফলপ্রদরূপে পরীক্ষিত ঔষধের তালিকা ও তাদের ব্যবহার বিধি দেওয়া হয়েছে। জনসাধারণ সেগুলি কাজে

লাগাতে পারেন ও আবশ্যকতা ৰোধে সে সম্বন্ধে অভিজ্ঞ আচার্যদের সঙ্গে পরামর্শ করে নিতে পারেন।

আমার সময় অত্যন্ত অল্প। তাই ব্যষ্টিগত ভাবে কারো সঙ্গে পত্রালাপ করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আসন, মুদ্রা, ঔষধ বা তাদের প্রয়োগবিধি সম্বন্ধে কারো কোন প্রশ্ন থাকলে তাঁরা যেন নিজের নিজের আচার্য বা আনন্দমার্গের স্থানীয় গ্রাম সমিতি বা জেলা কমিটি অথবা কেন্দ্রীয় কমিটির সচিবের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেন। অলমতি বিস্তারেণ।

জামালপুর, বিহার কার্ত্তিকী পূর্ণিমা, ১৯৫৭

–গ্রন্থকার

জামালপুর, বিহার

কার্ত্তিকী পূর্ণিমা,১৯৫৭

# সূচীপত্র

১) অজীর্ণ ২) অস্ত্রবৃদ্ধি

৩) অস্ত্র-পরিশিষ্টাঙ্গের বিকৃতি ৪) অম্লরোগ

৫) অর্শ ৬) আমাশয়

৭) উপদংশ (সিফিলিস)

৮) কর্কট রোগ (ক্যান্সার) ৯) কুষ্ঠ

১০) কৃশতা ১১) গরল ও কাউর

১২) ধাতুদৌর্বল্য ১৩) পক্ষাঘাত

১৪) পাকস্থলীর ক্ষত বা আন্ত্রিক ক্ষত

১৫) পিত্তাশ্মরী ১৬) পুরাতন গ্রন্থিস্ফীতি

১৭) প্রমেহ (গণোরিয়া) ১৮) বহুমূত্র

১৯) বধিরতা ২০) বাতরোগ

২১) মুষ্কশোথ (হাইড্রোসিল) ২২) মূত্রাশ্মরী

২৩) যক্ষ্মা ২৪) যৌন অক্ষমতা ও ক্লীবতা

২৫) রক্তচাপ রোগ ২৬) শ্লীপদ বা গোদ

২৭) শ্বাস রোগ বা হাঁপানি

২৮) শ্বিত্র (শ্বেত কুষ্ঠ বা ধবল)

২৯) সুপ্তি স্খলন

## ৩০)স্ত্রীব্যাধি

ক) ঋতুরোগ খ) ~~thank~~ গ) প্রদর

ঘ) জরায়ুর স্থানচ্যুতি ৫) বন্ধ্যাত্ব

৩১) স্থূলতা ৩২) হৃদরোগ

# ৩৩)পরিশিষ্টাংশ

ক) জলপান বিধি

খ) যৌন জীবন

গ) মৃত্তিকা প্রলেপ

ঘ) আতপস্নান

ঙ) বায়ুসেবন

চ) উপবাস বিধি

ছ) মানসিক শুচিতা

জ) যম সাধন

ঝ) নিয়ম সাধন

**********

এক ভরি সমান এক তোলা।

১৬আনায় ১ তোলা ;

৫ তোলায় ১ ছটাক ;  ৪ ছটাকে ১ পোয়া

৪ পোয়ায় ১ সের ;  ৪০ সেরে ১ মণ

১ আনা =  ০.৭২৮৯৮৭৭৩৮ গ্রাম

১তোলা = ১১.৬৬৩৮০৩৮ গ্রাম

১  পোয়া=২৩২.৫  গ্রাম

**********

# অজীর্ণ (Dyspepsia)

লক্ষণ: দুর্গন্ধযুক্ত ঢেকুর ওঠা, মুখে জল ওঠা, পেট ফাঁপা, অক্ষুধা, অরুচি, দেহস্থ বায়ুতে দুর্গন্ধ, শারীরিক দুর্বলতা, খিটখিটে মেজাজ, কোষ্ঠকাঠিন্য অথবা ছিবড়াযুক্ত তরল মল। কারণ: খাদ্য পাচকপিত্ত রসের সাহায্যে সরস পিণ্ডে পরিণত পর রক্তে রূপান্তরিত হয়। এই রক্তই দেহের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ধাতু। ফল-মূল, শাক-সব্জী ও বিভিন্ন ক্ষারজাতীয় বস্তু জীর্ণ হবার পর রক্তে ক্ষারের ভাগ বৃদ্ধি করে ও তার ফলে রক্তের সজীবতা রক্ষিত হয়। চর্বি ও শর্করা জাতীয় খাদ্য রক্তে অম্লভাগ বৃদ্ধি করে। রক্তে এই অম্লভাগের পরিমাণ মাত্রাধিক হয়ে গেলে দেহের রক্ত-পরিষ্কারক যন্ত্রগুলি যথা প্লীহা, যকৃৎ, হপিণ্ড, মুত্রাশয় প্রভৃতির উপর অত্যধিক চাপ পড়ে। রক্ত পরিষ্কারের কার্যে অত্যধিক ব্যস্ত থাকার ফলে তারা ক্রমশঃ দুর্বল হয়ে পড়ে ও পরিণামে যথাযথভাবে কাজ করতে অক্ষম হয়ে পড়ে। বিভিন্ন ধরণের রসাল ফল নিজের রসে জীর্ণ হয়; তাই তাদের

জীর্ণ করবার জন্যে যকৃতের পিত্তরসকে বিশেষ পরিশ্রম করতে হয় না। কিন্তু শ্বেতসার ও শর্করাজাতীয় খাদ্যকে জীর্ণ করতে গেলে মুখ- নিঃসৃত লালাই প্রাথমিক স্তরে সাহায্য করে। খাদ্যবস্তু দাঁতে চিবানোর ফলেই মুখে পরিমাণ মত লালার নিঃসরণ হয়। লালা-মিশ্রিত খাদ্য পাকস্থলীতে পৌঁছোবার সঙ্গে সঙ্গে যকৃৎ (liver) ও অগ্ন্যাশয় (pancreas) তাদের পাচকপিত্ত রস নিঃসরণে প্রেরণা পায়। তাই খাদ্য ভাল ভাবে চিবোনো না হ'লে যকৃৎ ভাল ভাবে কাজ করতে পারে না। খাদ্যে যদি আমিষের পরিমাণ বেশী থাকে সেক্ষেত্রে রক্তে অম্ল ভাগের আধিক্য হেতু শেষ পর্যন্ত অভ্যন্তরস্থ যন্ত্রগুলি দুর্বল হবার পর যখন গ্রহণী নাড়ীতে পৌঁছোয় তখন তার জন্যে দুর্বল অগ্ন্যাশয় (pancreas) যথোপযুক্ত পাচক পিত্ত নিঃসরণ করতে পারে না। তার ফলে ওই অর্ধজীর্ণ খাদ্য পূর্ণভাবে রসে পরিণত হয় না, ফলে ওই অজীর্ণ খাদ্য গ্রহণী নাড়ীতে ধীরে ধীরে পচে যেতে থাকে ও তার দ্বারা অন্ত্রের গতিপথও আংশিক ভাবে রুদ্ধ হয়ে যায়। এই দূষিত অর্ধজীর্ণ খাদ্য বিষাক্ত গ্যাস সৃষ্টি করে যা' দেহের শ্বাস-প্রশ্বাস ও বায়ুকে দুর্গন্ধ করে দেয়। শ্বাস-প্রশ্বাস

ক্রিয়া সেই বায়ু বিশুদ্ধীকরণে অক্ষম হয়ে পড়ে ও অর্ধজীর্ণ খাদ্য রক্তের অম্লভাগকে অত্যধিক পরিমাণে বাড়িয়ে দেয়। এই অবস্থার নামই অজীর্ণ বা ডিস্পেসিয়া রোগ।

অজীর্ণ রোগ নিজে প্রাণঘাতক নয় কিন্তু এর ফলে অনেক প্রাণঘাতক রোগের সৃষ্টি হতে পারে ও বৈবহারিক জগতে এই ব্যাধি কষায় বৃত্তিকে বাড়িয়ে দেবার ফলে মানুষ অত্যন্ত খিঁচিটে হয়ে পড়ে। অজীর্ণ রোগ থেকে পাকস্থলীর, অন্ত্রের ও মলনাড়ীর বিভিন্ন ধরণের ক্ষত, কোষ্ঠকাঠিন্য ও জটিল আমাশয় সৃষ্টি হবার সম্ভাবনা পূর্ণ মাত্রায় থেকে যায়।

চিকিৎসা:

প্রাতে: উৎক্ষেপ মুদ্রা, ময়ূরাসন, পদহস্তাসন, শয়ন বজ্রাসন, আগ্নেয়ী প্রাণায়াম।

সন্ধ্যায়: (যাদের কোষ্ঠকাঠিন্য) অগ্নিসার, দীর্ঘপ্রণাম, যোগাসন বা যোগমুদ্রা, ভুজঙ্গাসন। (যাদের তরল ভেদ)

অগ্নিসার ও সর্বাঙ্গাসন, আগ্নেয়ী মুদ্রা ও আগ্নেয়ী প্রাণায়াম!

পথ্য: পুরোনো চালের ভাত, সবুজ তরকারির ঝোল, তরলভেদে দধি ও কোষ্ঠকাঠিন্যে চীনী সহ মহিষী দুগ্ধের ঘোল। মনে রাখতে হবে ঘোল জিনিসটা ডিসপেপ্সিয়া (অজীর্ণ) রোগীর পক্ষে বিশেষ হিতকারী।

"দিনান্তে চ পিবেৎ দুগ্ধং নিশান্তে চ পিবেৎ পয়ঃ।
ভোজনান্তে পিবেৎ তক্রং কিং বৈদ্যসা প্রয়োজনম!!"

বিধি-নিষেধ: আহারে বৈষম্যের ফলে অজীর্ণ রোগের সৃষ্টি। অক্ষুধায়, অল্প ক্ষুধায় আহার করা, দিনের পর দিন গুরুপাক (rich) খাদ্য গ্রহণ, নেশার জিনিস ব্যবহার করা, সুস্বাদু খাদ্য বস্তু পেয়ে লোভের বশে মাত্রাধিক খাওয়া, আহারের পরে বিশ্রাম না নিয়েই কার্যালয়ের দিকে ছোটা , সম্পূর্ণ উদর পূর্ণ করে খাওয়া (শাস্ত্র মতে অর্ধাংশ খাদ্য, 'এক চতুর্থাংশ জল ও এক চতুর্থাংশ বায়ু, গমনাগমনের জন্যে খালি রাখা উচিত),

শারীরিক পরিশ্রম না করা ও তৎসহ মানসিক পরিশ্রম বা কামুকতাকে প্রশ্রয় দেওয়া- এগুলিও রোগের পক্ষে ক্ষতিকর। - রোগ সম্পূর্ণ না সারা পর্যন্ত সকালে বিকালে জলখাবার না খাওয়াই ভাল। একান্তই যদি ক্ষুধা পায় তবে রসাল টক বা মিষ্টি ফল- বিশেষ করে, ঈষদম্ল ফল যেমন আঁব, আনারস, জাম, সর্বপ্রকার নেৰু, (নেবু অম্ল রসযুক্ত হ'লেও শরীরে এর প্রভাব ক্ষারধর্মী) ও কোষ্ঠকাঠিন্য থাকলে মনে রাখা দরকার যে নেৰু, দধি প্রভৃতি অম্ল রসযুক্ত খাদ্য সর্বদাই সামান্য জল ও লবণের সঙ্গে গ্রহণ করতে হবে। রোগীর পক্ষে ক্ষুদ্র মৎস্য ব্যতিরেকে সর্বপ্রকার আমিষ খাদ্যই ক্ষতিকর। মাংস ও ডিম বিষবৎ। নেশার জিনিস কোষ্ঠকাঠিন্যকে বাড়িয়ে দেয়, তাই তাও বর্জনীয়। এই রোগে প্রত্যহ মুক্ত বায়ুতে ভ্রমণ ও সামান্য পরিশ্রম অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। দিবানিদ্রা, রাত্রিজাগরণ নিষিদ্ধ। রাত্রির আহার আট ঘটিকার পূর্বে প্রশস্ত ও আহারান্তে অল্প ক্ষণ ভ্রমণ করা বিশেষ হিতকর। ডাল নিজে ক্ষারধর্মী হলেও গুরুপাক, তাই অজীর্ণ রোগে বর্জনীয়।

খাদ্যগ্রহণ ও মলত্যাগ দক্ষিণা নাড়ী প্রবাহকালে করাই বাঞ্ছনীয় ও আহারের পরেও কিছুক্ষণ দক্ষিণাকে প্রবাহিত রাখা উচিত কারণ ওই সময় পচন ক্রিয়ার সহায়ক গ্রন্থিগুলি থেকে যথেষ্ট পরিমাণ রস নির্গত হতে থাকে। একাদশীতে উপবাস আর পূর্ণিমা ও অমাবস্যায় নিশিপালন বিধেয়।

কয়েকটি ব্যবস্থা:

১) এক আনা পরিমাণ হিং ঘিয়ে ভেজে সম পরিমাণ সৈন্ধব লবণের সঙ্গে মিশিয়ে ভোজনের প্রারম্ভে ব্যবহার করা।

২) সাজা পাণের সঙ্গে অথবা মৌরীর সঙ্গে খড়ি-নারকোল অথবা নারকোল-কুরো ব্যবহার করা।

৩) নুনে জারিয়ে জামির (জামেরী) নেবু ব্যবহার করা।

৪) প্রত্যহ রাত্রে আহারের পর এক আনা পরিমাণ (কিছুতেই তার বেশী নয়) কথিকাভস্ম* (* গিঁটে কড়ি ও গোঁড়া নেবুর রসের সাহায্যে এই ভস্ম তৈরী করতে হয়।) পাণ পাতায় মুড়ে খাওয়া।

৫) সমান পরিমাণ হরীতকী (জলে ফেললে যে হরীতকী ভেসে ওঠে ঔষধার্থে তা বর্জনীয়) ও মৌরী-চূর্ণ দ্বিগুণ পরিমাণ কাশীর চীনীর সঙ্গে মিশিয়ে বেটে কিছু দিন ব্যবহার করা।

সূচীপত্র

# অন্ত্রবৃদ্ধি (Hernia)

লক্ষণ : অজীর্ণ খাদ্য বা সঞ্চিত দূষিত মলের চাপে অথবা তজ্জনিত দূষিত বায়ুর প্রকোপে নাড়ী স্বস্থানচ্যুত হয়ে আবরণীর ছিদ্রপথ দিয়ে যখন বেরিয়ে আসে তখন তাকে বলা হয় অন্ত্রবৃদ্ধি

(হার্ণিয়া)। স্বস্থানচ্যুত নাড়ী যখন মুষ্ক-সংযোজক ধমনীর গতিপথস্থ ছিদ্রমুখে বহির্গত হয় তখন তাকে বলা হয় ইনগুইন্যাল হার্ণিয়া (Inguenal Hernia)। নাড়ী যখন পদদ্বয়ের নিয়ন্ত্রক ধমনীর স্নায়ুতন্ত্রীর গতিপথের ছিদ্রমুখ দিয়ে ঠেলে বেরিয়ে আসে তখন তাকে বলা হয় ফেমোরাল হার্ণিয়া (Femoral Hernia)। কখনও কখনও শিশুদের নাভিছিদ্রের পথ দিয়ে নাড়ী ঠেলে বেরিয়ে যায়; তাকে বলা হয় আম্বিলিক্যাল হার্ণিয়া (Umbilical Hernia)। যতক্ষণ ওই বর্দ্ধিত নাড়ী ঠেলে ভেতরে পাঠিয়ে দেওয়া সম্ভবপর থাকে অথবা বায়ুর আকর্ষণের দ্বারা সাময়িকভাবে স্বস্থানে নিয়ে যেতে পারা যায় ততক্ষণ ব্যাধিটি কষ্টদায়ক হলেও প্রাণঘাতী হ'তে পারে না। কিন্তু ওই বর্দ্ধিত নাড়ী যখন দড়ির মত শক্ত হয়ে যায় ও দেহের নিম্নাংশের কাজকর্মে বাধা সৃষ্টি করে তখনই তাকে রোগের চরম পরিণতি বলা যেতে পারে। বর্দ্ধিত নাড়ী যখন মলদ্বারের চাকে জড়িয়ে গিয়ে রোগীর চরম ক্লেশের কারণ হয় হার্ণিয়ার সে অবস্থাকে স্ট্র্যাংগুলেটেড হার্ণিয়া (Strangulated Hernia) বলা হয়।

কারণঃ শরীরে খাদ্য গৃহীত হবার পর পাকস্থলীতে তা' অর্ধজীর্ণ হবার পরে পূর্ণ পরিপাকের জন্যে গ্রহণী নাড়ীতে (ঊর্ধ্ব অন্ত্র) প্রেরিত  হয়। অতিরিক্ত আমিষ ও চর্বি জাতীয় খাদ্য গ্রহণের ফলে রক্তে অম্লভাগ বৃদ্ধি পায় ও তার পরিণামে বিভিন্ন রসস্রাবী গ্রন্থিগুলি দুর্বল হয়ে যায়। অর্ধজীর্ণ খাদ্যগুলি দেহের অভ্যন্তরে পচতে আরম্ভ করে ও তার ফলে সৃষ্ট বিষাক্ত দূষিত বায়ুর চাপ মলপূর্ণ অন্ত্রের উপর পড়লে নাড়ীর স্থানচ্যুতি ঘটে। খাদ্য বস্তুসমূহকে যথাযথভাবে জীর্ণ করতে যকৃতের (লিবারের) অক্ষমতাই এই রোগের প্রধান কারণ।

চিকিৎসাঃ (আসন ও মুদ্রা)

প্রাতেঃ উৎক্ষেপ মুদ্রা, অশ্বিনী মুদ্রা, ময়ূরাসন, পদহস্তাসন, উড্ডয়ন ও আগ্নেয়ী প্রাণায়াম।

সন্ধ্যায়ঃ উড্ডয়ন, সর্বাঙ্গাসন, অশ্বিনী মুদ্রা বা আগ্নেয়ী প্রাণায়াম।

পথ্য: আহারে অমিতাচারের ফলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে রোগটির উদ্ভব হয়ে থাকে। তাই এ রোগে খাদ্য বিষয়ে অত্যন্ত সর্তক থাকা উচিত; বিশেষ করে আমিষ খাদ্যে ও যে সকল খাদ্যে কোষ্ঠকাঠিন্য হয় সেগুলি থেকে খুবই সতর্ক থাকতে হয়। পেটে যাতে বেশী চাপ না পড়ে সেজন্যে হার্ণিয়া রোগী কখনও উদর পূর্ণ করে খাৰে না ও একটু একটু করে অনেক বার খাওয়া বাঞ্ছনীয়। দিনে একটু একটু করে অনেক বার জল অথবা নেবুর রস-মিশ্রিত জল পান করা বিধেয়। হার্ণিয়া রোগীকে মনে রাখতে হবে যে সব সময়েই তার মধ্যে যেন একটুখানি ক্ষুধা ভাব বজায় থাকে। হার্ণিয়া রোগী মলত্যাগকালে কোঁথ দেওয়ার অভ্যাস ত্যাগ করবে।

বিধি-নিষেধ: এই রোগীর সামনে ঝুঁকে ভারী জিনিস তোলা, অতিরিক্ত লম্ফঝম্ফ করা, লোভের বশে অতিরিক্ত খাওয়া, কামুকতাকে প্রশ্রয় দেওয়া অত্যন্ত ক্ষতিকর।

# অন্ত্রপরিশিষ্টাঙ্গের বিকৃতি (Appendicitis)

লক্ষণ: পরিশিষ্টাঙ্গ ফুলে ওঠা ও তৎসহ তলপেটে অসহ্য যন্ত্রণা, ক্ষুধা বা খাবার ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও রোগীর খেতে ভয় পাওয়া।

কারণ: শারীরিক পরিশ্রমবিমুখতা, বন্ধ ঘরের মধ্যে অত্যধিক সময় থাকা, খেলাধূলা ও ব্যায়ামাদি না করা, কোষ্ঠকাঠিন্য ও এই দোষগুলির সঙ্গে অতিরিক্ত পরিমাণ খাদ্য গ্রহণ।

চিকিৎসা: আসন, মুদ্রা, পথ্য, বিধি-নিষেধ অজীর্ণ রোগের অনুরূপ।

এই ব্যাধিতে ছিবড়াযুক্ত খাদ্য, সর্বপ্রকার আমিষ খাদ্য, আতপ চাল, যে সকল খাদ্য গ্রহণের ফলে কোষ্ঠকাঠিন্য দেখা দিতে পারে সেগুলি কঠোরভাবে বর্জনীয়।

# অম্লরোগ (Acidity)

লক্ষণ: শারীরিক দুর্বলতা, অম্ল বা অল ঢেকুর ওঠা, মাথা ঘোরা, পেট জ্বালা, বুক জ্বালা ইত্যাদি।

কারণ  ও প্রাণবায়ু রূপে গৃহীত অক্সিজেন (oxygen) উদরে নিয়ে অম্লয়ান বায়ুতে (carbon-dioxide) পরিণত হয়। এই অন্নবস্তুর প্রেরণাতে অভ্যন্তরস্থ পাচক পিত্তরসপ্রার্থী গ্রন্থিসমূহ উজ্জীবিত হয়। দিনের পর দিন ধরে আহারে অনিয়ম ও অত্যাচার চলতে থাকলে অ বা অয় ক্ষুধায় জোর করে আহার করলে বা লোভের বশে গুরপাক খাদ্য গ্রহণ করা অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেলে পচক রসের পক্ষে গৃহীত খাদ্যকে যথাযথভাবে জীর্ণ করা সম্ভব হয় না। এক দিকে যেমন অজীর্ণ বা অর্ধজীর্ণ খানা বিষবাষ্পে পরিণত হয় অন্য দিকে ঠিক তেমনি ক্ষরিত পাচক রসও ক্রমশঃ দূষিত  অম্লে পরিণত হতে থাকে। পাচক রস জিনিসটা নিজে অম্লাত্মক কিন্তু স্বাভাবিক অবস্থায় খাদ্যকে জীর্ণ করতে গিয়ে সে নিজেও জীর্ণ হয়ে যায়। কিন্তু

উপরিলিখিত অনিয়মের ফলে তার পক্ষে খাদ্য জীর্ণ করা সম্ভব না হলে নিজেও অর্ধীর্ণ থেকে যান। দূষিত খাদ্যসৃষ্ট বিষবাষ্প ও তৎসহ এই অজীর্ণ পাচক রসের বিবৃত্তির ফলে সৃষ্ট দূষিত অম্লরসই অম্লরোগের (এসিডিটির) কারণ। এই অম্লাত্মক দূষিত বায়ু ও রস উদরে জ্বালা সৃষ্টি করে, বুকে উঠলে বুক জ্বালা করে, গলায় ডিঠলে গলা জ্বালা করে ও তার ঊর্ধ্বে উঠলে যাথা ঘোরে। এই অম্লদোষের অত্যাধিক্যের ফলে রক্ত অম্লপ্রধান হতে থাকে ও তাকে পরিশোষনের কার্যে অত্যধিক ব্যস্ত থাকার ফলে রক্তশোধন- মন্ত্রগুলি দুর্বল হয়ে পড়ে ও রোগী দূর্বলতা অনুভব করে। রক্তের এই অম্লাধিক্য যখন দেহের স্থানে স্থানে (বিশেষ করে গাঁটে) স্ফীতি ও তজ্জনিত যন্ত্রণা সৃষ্টি করে তাকেই বলা হয় বাতরোগ।

রক্তে অত্যধিক অম্লদোষ দেখা দিলে তাকে পরিশোধনের জন্যে

সেহরন্ত্রের পক্ষ থেকে যখন তীব্রভাবে চেষ্টা চালানো হয় সে অবস্থাকে অম্লশূল বলা হয়।

চিকিৎসাঃ (আসন ও মুদ্রা)

প্রতে। উৎক্ষেপ মুদ্রা, ময়ূরাসন, পদহস্তাসন, উ৯৬য়ন, অগ্নিসার, আগেরী মুদ্রা বা আগ্নেয়ী প্রাণায়াম। সন্ধ্যায়ঃ অগ্নিসার, পশ্চিমোরনাসন, সর্বাঙ্গাসন, আগ্নেয়ী মুদ্রা বা

আগ্নেয়ী প্রাণায়ান।

পথ্যঃ অম্লরোগে পুরাতন চালের ভাত, শাক-সব্জীর  ঝোল (ভাজা, পোড়া বা অধিক পরিমাণ শাক-সব্জী নয়), রসাল  টক বা মিষ্টি ফল বা ঘোল বিশেষ উপকারী। অম্লরোগীর পক্ষে দধি বিশেষ হিতকারী নয়।

বিধি-নিষেধঃ অম্লরোগীর পক্ষে খোলা হাওয়ায় ভ্রমণ করা, ক্ষুধা রেখে খাওয়া, অল্প অল্প করে সারা দিনে অনেকটা জল পান করা বিশেষ প্রয়োজন। এই রোগে নারকোল ও তজ্জাত খাদ্য ও ঔষধ বিশেষ উপকারী। রোগীর পক্ষে জল খাবার না খাওয়াই ভাল।

ক্ষুধা সহ্য করা কষ্টকর হলে অলখাবার হিসাবে সামান্য পরিমাণ রসাল ফল ব্যবহার করা যেতে পারে। এই রোগে অনেক সময় এমনও হয় যে পুরাতন অভ্যাসের ফলে পাচক রসজাবী গ্রন্থিসমূহ খুব বেশী পরিমাণ রস নিঃসারিত করে দেয় ও তার ফলে রোগী সময়ে অসময়ে হঠাৎ খুব বেশী ক্ষুধা (যাকে বলে রাক্ষুসে ক্ষুধা) অনুভব করে। তাই আমরা দেখি যে অম্লরোগী প্রায়ই অম্লের জন্যে মনমরা হয়ে থাকে বা সকলকে তার রোগের কথা বলে বেড়ায়, সেও আহারে বসে মাদ্রাতিরিক্ত খেয়ে ফেলে। এগুলি আসলে রোগীর পুরাতন অভ্যাসের মত নির্দিষ্ট সময়ে

যৌগিক চিকিৎসা ও প্রাণ

পাচক রস নিঃসরণের পরিণাম। এই রাক্ষুসে ক্ষুধা বা অগুত ক্ষুধা থেকে সতর্ক হওয়া প্রয়োজন। রোগীর কিছুতেই বিধি নিষেগের বহির্ভূত হওয়া উচিত নয়। অতিরিক্ত পাচক রস নিঃসরণের ফলে যে রাক্ষুসে ক্ষুধার উদ্ভব হয় বড় গ্লাসের এক গ্লাস জল পান করলে সে ক্ষুধা সুম্বীভূত হয়।

অম্লরোগের রোগী যখন যন্ত্রণা অনুভব করে সে সময়ে তার পক্ষে ঈষদুষ্ণ জলে কমলার রস পান করা বিধেয়। যন্ত্রণা প্রশমিত হয়ে যাবার পর শীতল জলে নেবুর রস পান করা উচিত। অর্থীর্ণ রোগের ন্যায় এই রোগেও অহারকালে ও ডৎপরে ঘন্টাখানেক দক্ষিনা নাড়ী প্রবাহিত রাখা উচিত। অম্লশূলের উৎকট যন্ত্রণার সময় যন্ত্রণার সূত্রপাতকালীন নাসাটি পরিবর্তন করে দেওয়া উচিত। ক্ষুধার সময় গাদ্য গ্রহণ না করে ক্ষরিত পাচক পিশুকে সদিও হবার সুযোগ দেওয়া কিছুতেই উচিত নয় কারণ সেক্ষেত্রে এই অর্জীর্ণ পাচবা নির্ভই অম্লরোগের কারণ হয়ে

কয়েকটি ব্যবস্থা:

১) সাজা পাণের সসে ঘড়ি-নারকেল অথবা মোরীর সঙ্গে নারকোল-কুমো ব্যবহার করা।

২) শূলরোগী, যন্ত্রণায় অত্যধিক কাতর হয়ে পড়লে সমান পরিমাণ খড়ি (হক্কসমস্ত) ও আডপচান-গুঁড়ো এক সঙ্গে দিয়ে (আধ)।

তোলা পরিমাণ খেলে যন্ত্রণার অণ্ডে উপশম হয়।

৩) তেঁতুল-ছাল পোড়ালে সেই ছাইয়ের বে শাদা অংশটা পাওয়া যায় আর এক আনা পরিমাণ নিয়ে শীতল জলের সঙ্গে পান করা। ৪) মাটির বদ্ধ পাত্রে সমান ওজনের শ্বেত আকন্দের পাতা ও

সৈন্ধব লবণ একত্রে ভষ্ম করে এক আনা পরিমাণ খাওয়া।

(৫) অজীর্ণ রোগের মত অম্লরোগেও এবংদর্শী তিথিতে উপবাস ও অমাবস্যা আর পূর্ণিমায় নিশিপালন করা বাঞ্ছনীয়।

সূচীপত্র

# অর্শ (Piles)

লক্ষনঃ শরীরস্থ দূষিত বায়ু ও দুষ্ট রক্ত যথাযথভাবে শরীর থেকে বেরিয়ে যেতে না পারলে তাদের চাপে মলদ্বারের চতুষ্পার্শস্হ শিরা- উপশিরাগুলি ফুলে উঠে ও ফুলে গিয়ে শেষ পর্যন্ত গুটির রূপ ধারণ করে। এই গুটিগুলিকে 'বলি' বলা হয়। বলি মলদ্বারের বহির্মুখে উৎপন্ন হলে তাকে বলা হয় 'বহির্বদি' ও ভেতরের দিকে উৎপন্ন হলে তাকে বলা হয় 'অন্তর্বনি'। অপান বায়ুর চাপে এই বলি থেকে যখন রক্ত বের হয় এখন তাকে বলা হয় রক্তার্শ। অর্শে এই রক্ত যে ঝরতেই হবে এমন কোন কথা নেই। রক্ত না ঝরে বলিতে যদি কেবল কট্ কট্, ঝন্ ঝন্ জ্বালা বা চুলকানির ভাব থাকে তাও অর্থ পর্যায়ভুক্ত। এ ধরণের অর্শকে শুষ্কার্শ বলা হয়।

কারণঃ যকৃতের (ক্ষব্দউুষ্ট) দোষজনিত কোষ্ঠকাঠিন্য এই রোগের প্রধান কারণ ফিন্তু সাধারণতঃ কেবলমাত্র একটি কারণে বোন গুরুতর ব্যাধি আত্মপ্রকাশ করতে পায়ে না। অন্যান্য গুরুতর ব্যাধির মত অর্শও একটি সর্বাদিহিক ব্যাধি, তাই এরও আরও অনেকগুলি কারণ ভয়েছে। তার মধ্যে প্রধান হ'ল শারীরিক পরিশ্রমের অভাব ও দ্বিতীয় হ'ল অতিরিক্ত সহবাস

মলত্যাগকালে কোঁথ দেখার অভ্যাসও অনেক সময় এ রোগকে চাগিয়ে তোলে। মনে রাখা দরকার যকৃতের দোষের সঙ্গে কোষ্ঠকাঠিন্য না থাকলে অর্শ রোগ কিছুতেই দেখা দিতে পারে না।

চিকিৎসা: (আসন ও মুদ্রা

প্রাতে: উৎক্ষেপ মুদ্রা, উদ্‌য়ন, জানুশিরাসন, শলভাসন বা যৌগিক চিকিৎসা ও প্রখ্যগুণ

ময়ুরাসন, অগ্নিসার, পদহস্তাসন, অশ্বিনী মূদ্রা।

সন্ধ্যায়: অগ্নিসার, ভস্ত্রিকাসন, সর্বাঙ্গাসন, মৎস্যমুদ্রা, শশাঙ্গাসন ও অশ্বিনী মুদ্রা।

পথ্য: অর্শ রোগী ক্ষুধা থাকলে ভোরের দিকে রসাল, মিষ্টি ফল খাবে। দ্বিপ্রহরে খুব বেশী শাক-সান্ত্রী বা শাক-সন্ত্রীর ঝোলের সঙ্গে অল্প পরিমাণ ভাত বা টাটকা রুটি খাবে। ওল, ঘোল, ঝোল

ডুমুর, মানবন্ধু, পটোল, টমেটো, পালং শাক, ছাঁচি কুমড়া, লাউ ও নুনে শাক এই রোগে বিশেষ উপকারী। রোগী দু' বেলা এক গ্লাস করে ঘোল খাবে।

বিধি-নিষেধ। অস্ত্রোপচারের সাহায়ে বলি খসিয়ে দিলে বা অন্য কোন প্রক্রিয়ায় রক্তক্ষরণ বন্ধ করে দিলে এই রোগের স্থায়ী নিযুক্তি সম্ভব নয়, কারণ রোগের মূল কারণগুনি যদি অপরিবর্তিত থাকে সেক্ষেত্রে যে কোন সময় রোগের পুনরাক্রমণ হ'তে পারে বা দেহস্থ দূষিত বায়ু ও রক্ত অন্য কোন রোগ সৃষ্টি করতে পারে। তাই রোগের বাড়াবাড়ি অবস্থায় রক্তপাত বন্ধের অন্যে কোন সাময়িক ব্যবস্থা নেওয়া অন্যায় না হলেও রোগের স্থায়ী নিবৃত্তির জন্যে যকৃৎটিকে (লিভারটিকে) সারিয়ে তুলতেই হবে। যকৃৎ সুস্থ হয়ে উঠলে অন্য কোন প্রকার চিকিৎসার সাহায্য বারিরেকেই রোগ সেরে যাবে। দ্বিপ্রহরের দিকে যাতে বেশ চনচনে ভূষা থাকে রোগীকে যে দিকে খুব নজর রাখতে হবে। এই রোগে অতিরিক্ত ক্ষারযুক্ত খাদ্যসমূহকে সযত্নে বর্জন করতে হবে। ঘোড়, মোয়া, কাঁচকলা, মেওয়া ফল ব্যবহার না

করাই বাঞ্ছনীয়। এই রোগের বাড়াবাড়ি অবস্থায় উপবাস দেওয়াই বাঞ্ছনীয়। উপবাসকালে প্রচুর জল ও ইচ্ছামত প্রচুর পরিমাণে জল সহ টক বা মিটি নেবুর রস ব্যবহার করা যেতে পারে। অর্শরোগীর পক্ষে ঝাল, নোনতা ও রুক্ষ জিনিস না খাওয়াই উচিত।

কয়েকটি ব্যবস্থা:

১) মলত্যাগের পর ফিটকিরি মেশানো জলে জলশৌচ করবে। বলির উপর কচি নিমপাতা দিয়ে তৈরী নিম ঘি ঈষৎ গরম অবস্থায় লাগিয়ে দিলে কয়েক দিনের মধ্যেই রোগ সেরে যায়। শয়নের পূর্বেও

নিম ঘি ব্যবহার করা বাঞ্ছনীয়। ২) ভোরে খালি পেটে দু' তোলা (২ তোলা) পরিমাণ দুদ্ধক্ষীরার

রস পান করলেও ভাল ফল পাওয়া যায়। ৩) অত্যবিক রক্ত ঝরতে থাকলে দিনে দু' বার ২/১ তোলা পরিমাণ কুকসিমা, অভাবে দুর্বার রস পান করলে ভাল ফল পাওয়া

৪) ভোরে দু' তোলা (২ তোলা) মাখনের সঙ্গে এক তোলা খোসা-ছাড়ানো কৃষ্ণ তিল মিশিয়ে খেলে বেশ সুফল পাওয়া যায়। ৫) শিমূল তূলা কুকসিমার রসে ভিজিয়ে বলির উপর পটির মত লাগিয়ে রেখে করেক দিন রৌদ্র লাগালে বলি বীরে ধীরে খসে যায়।

৬) দু' তোলা হরীতকী গোমূত্রে পিষে ইক্ষু গুড় সহ ২১ দিন নিয়মিত ভাবে লেহন করে খেলে অর্শ রোগে সুন্দর কাজ করে। ৭) পুরোনো যেজুর গুড়ের সরবৎ ভোরে ধীরে ধীরে চুমুক দিয়ে পান করলেও অর্শের প্রকোশ প্রশমিত হয়।

৮) অর্শ রোগীর পক্ষে ভোজনের পূর্বে ও পারে ব্যাপক শৌচক্রিয়া অবশ্য করণীয়।

সূচীপত্র

# আমাশয় ( Dysentery )

**লক্ষণঃ** বার বার মলের বেগ আসা ও অল্প পরিমাণে মল নিঃসারিত হওয়া , কুস্থনের ইচ্ছা , নাভির নিকটে যন্ত্রণা প্রভৃতি।

**কারণঃ** অজীর্ণ , অর্ধসিদ্ধ বা অসিদ্ধ মাংস বা দাল বা অনুরূপ বস্তু যখন উদরস্থ দূষিত বায়ুর সঙ্গে মিলিত হয়ে অন্ত্রে অস্বাভাবিক ধরণের প্রতিক্রিয়া ঘটায় ও পাচক পিত্তরস সমস্ত প্রচেষ্টার সাহায্যেও তাকে জীর্ণ করতে পারে না তখন সেই দূষিত বস্তুগুলি তরল ভেদাকারে নির্গত হয়ে যায় । কিন্তু এই তরল মল যদি স্বাভাবিক গতিপথ না পায় তখন তা , অন্ত্রের অভ্যন্তরে বিশ্রী ভাবে পচতে আরম্ভ করে ও শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীগুলিকে পচাতে

আরম্ভ করে , সে অবস্থায় শরীরের বিভিন্ন রসস্রাবী গ্রন্থগুলি অধিকতর পরিমাণে রসক্ষরণ করে দেহাভ্যন্তরে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনবার চেষ্টায় রত হয় । ওই রসগুলি অজীর্ণ খাদ্য ও অভ্যন্তরস্থ অন্যান্য দূষিত বস্তুর সংস্পর্শে এসে কফাকার প্রাপ্ত হয় , আর তাই আমাশয় রোগীর মল কফযুক্ত হয়ে থাকে । এই কফ নিজে কোন রোগ নয় , এরা রোগ সারাবার প্রাকৃতিক ব্যবস্থা মাত্র ।

**চিকিৎসা** ঃ ( আসন ও মুদ্রা ) **প্রাতে** ঃ উৎক্ষেপ মুদ্রা , পদহস্তাসন , অগ্নিসার , উড্ডয়ন , আগ্নেয়ী মুদ্রা বা আগ্নেয়ী প্রাণায়াম । **সন্ধ্যায়** ঃ ওই । **পথ্য** ঃ আমাশয়ে খালি পেটে থাকা একেবারেই নিষিদ্ধ । সমস্ত রকমের ভাজা , পোড়া , দাল ও আমিষ খাদ্য ও ঘৃত , তৈল ও চর্বি জাতীয় জিনিস অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে পরিত্যাগ করা উচিত । জ্বর থাক বা না থাক , রোগাক্রমণের প্রথমের দিকে নেবুর রস - মিশ্রিত ( কমলা হলেই ভাল হয় ) জল ব্যতীত আর কিছুই পান করা উচিত নয় । এই ভাবে দুল্ক এক দিন পাকস্থলীকে বিশ্রাম দেবার পর ধীরে ধীরে অন্যান্য খাদ্য গ্রহণ করৰে । টাটকা গরম ভাত আধ মিনিটের

মত সময় জলে ভিজিয়ে তুলে নিয়ে তার সঙ্গে অল্প পটোল , গাঁদাল , তেলাকুচা বা থানকুনি পাতার ঝোল , ঘোল প্রভৃতি ব্যবহার করা যেতে পারে । সর্বদা মনে রাখতে হবে যে এই রোগে ঔষধ অপেক্ষা পথ্যে বেশী নজর রাখতে হয় । জলখাবার হিসাবে ইক্ষুগুড়ের সঙ্গে ৰেলপোড়া , অথবা সুপক্ক কলা খোসা ছাড়িয়ে ঘিয়ে ভেজে ব্যবহার করা যেতে পারে । এইগুলি আহার ও ঔষধ দুল্লয়েরই কাজ করে । রোগ যাদের বেশী পুরোণো তারা রাত্রে ( অবশ্যই রাত্রি ৯ টার মধ্যে ) সামান্য লবণ সহ গরম গরম নুচি খেতে পারে । জলখাবার হিসাবে পুরাতন রোগী গরম জিলিপি ব্যবহার করতে পারে । রোগী আহারের সময় খুব অল্প পরিমাণ ( দু ল্ক তোলার বেশী নয় ) পুরাতন তেঁতুলের চাটনি , বিশেষ করে পাকা কলার সঙ্গে পুরাতন তেঁতুলের চাটনি ব্যবহার করলে বেশ সুফল পাবে । বিধি - নিষেধ : আমাশয় রোগীর পক্ষে নিম্নোদরে ঠাণ্ডা লাগানো অত্যন্ত ক্ষতিকর । রোগীর পক্ষে দুগ্ধ অপেক্ষা দধি , ও দধি অপেক্ষা ঘোল বেশী উপকারী । রোগের বাড়াবাড়ি অবস্থায় তল পেটে ফ্লানেল জড়িয়ে রাখলে ফল ভাল হয়ে থাকে ।

**কয়েকটি ব্যবস্থা** : ১ ) রোগের বাড়াবাড়ি অবস্থায় অতিরিক্ত রক্তক্ষরণ হতে থাকলে প্রাতে , অথবা প্রাতেও সন্ধ্যায় দুবেলাই রোগীকে অল্প পরিমাণ দুর্বার রস বা কুসিমা ( কুকুরশোঁকা ) পাতার রস খাইয়ে দিলে বেশ সুফল পাওয়া যায় ।

২) সিকি তোলা বাকলা কুঁড়ি বাতাসার সঙ্গে পিষে চুয়ে চুয়ে খেলে আমাশয়ে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়।

৩) আধ তোলা বটের ঝুরি (কচি অংশ) চাল-ধোয়া জলের সঙ্গে বেটে খেলে-

অথবা

৪) আমপাতা, জামপাতা ও আমরুল পাতার রস দু'তোলা আন্দাজ ছাগ দুগ্ধের সঙ্গে খেলে-

অথবা

৫) প্রাতে চীনী সহ কিছুটা আমরুল পাতার বস খালি পেটে খেলে

অথবা

৬) একটু মৌরী, একটু মুসুরির ভাল সামান্য মিছরির সঙ্গে পাথরের বা কাঁচের পাত্রে পূর্ব দিন রাত্রে ভিজিয়ে রেখে পর দিন সকালে সেগুলিকে একত্রে বেটে সরবতের মত পন করলে ও অনুরূপভাবে সকালে ভিজিয়ে রেখে সন্ধ্যায় পাণ করনে অতি অল্প সময়ের মধ্যে বিশেষ ফল পাওয়া যায়।

সূচীপত্র

# উপদংশ (Syphilis)

এই রোগটি ভারতের কোন পুরোনো রোগ নয়। কয়েক শতাব্দী পূর্বে ইয়োপ থেকে এই রোগ এদেশে প্রবেশ করে। অনেকের মতে রোগটির প্রথম সৃষ্টি কুকুরের দেহেই হয়েছিল। পরে কুকুরের দেহের সান্নিধ্য হেতু মনুষ্য দেহে সংক্রমিত হয়ে পড়েছে।

**লক্ষণঃ** প্রাথমিক পর্যায়ে এই রোগে শরীরের কোন কোন অংশে, বিশেষ করে জননযন্ত্রে ফুসকুড়ি দেখা দেয়। ওই ফুসকুড়ি থেকে পুঁজ বা রসক্ষরণ হয় না। তারপর সাধারণতঃ উরুসন্ধিতে বাগি দেখা দেয়। এই ফুসকুড়ি বা বাগি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অল্প দিনের মধ্যে শুকিয়ে যায় বা সেরে যায়। এ অবস্থায় রোগকে অনেকে ঠিক ভাবে চিনতে পারে না, কারণ এ কথাটা ঠিক যে ফুসকুড়ি মাত্রেই উপদংশ-সঙ্গাত নয় ও উরুসন্ধির স্ফীতি (কুঁচকির গ্রন্থি-ফোলা) মাত্রেই যাগি নয়।

রোগের দ্বিতীয় পর্যায়ে শরীরে রোগের প্রকার ভেদ অনুযায়ী ছোট বড় নানা আকারের ক্ষত দেখা দেয় ও ওই ক্ষতগুলি থেকে বিভিন্ন রঙের ও বিভিন্ন লক্ষণযুক্ত রস নির্গত হতে থাকে।

শরীরের বায়ু, 'অতি কূপিত হওয়ার ফলে যে উপদশে যোগ ফুটে ওঠে তাকে বলা হয় "বাতজোপদংশ"। এই উপদংশের ক্ষত কৃষ্ণবর্ণ, সুচীবেধের ন্যায় যন্ত্রণাদায়ক। এতে দপদপানি বা চিড়িক মারার মত ভাব থাকে। রোগীর দেহ যেখানে পিত্তদোষে জর্জরিত হয়ে পড়েছে সেখানে সেই দেহে যে উপদংশ প্রকট হয় তাকে বলা হয় "পিত্তজোপদংশ"। এই উপদংশের ক্ষত পীতবর্ণ, দেখতে অভ্যন্ত বিশ্রী ও নোংরা ও এতে জ্বালাপোড়ার ভান বেশীই থাকে। অনুরূপভাবে যেক্ষেত্রে কফদুষ্টি ঘটেছে সেক্ষেত্রে রোগের নাম দেওয়া হয় " কফজোপদংশ ”। এতে কফের রঙ হয় শাদা , আকার কিছুটা বৃহৎ। এ থেকে রসক্ষরণ হয় বেশী ও চুলকানির ভাবটা থাকে একটু বেশী মাত্রায়। অতিরিক্ত রক্তদৃষ্টির ফলে উদ্ভুত রোগকে বলা হয় “রক্তজোপদংশ "। এতে উদ্ভেদের রঙ হয় তামাটে বা লালচে ও তার থেকে লালচে রঙের রস ক্ষরিত হয়। যেখানে বায়ু , পিত্ত, কফ তিনেরই ব্যাপকভাবে বিকৃতি ঘটেছে , সেখানে উপদংশকে বলা হয় “ ত্রিদোষজোপদংশ ”। এতে কম - বেশী উল্লিখিত সকল প্রকারের লক্ষণই থাকে।

উপদংশ ( syphilis ) ও ৰাগি ( soft chancre ) দু'টি সম্পর্কযুক্ত রোগ হ'লেও বা তাদের কারণও মোটামুটি ভাবে এক হলেও রোগ দুটি কিন্তু বিভিন্ন। উপদংশে উরুসন্ধির স্ফীতি যে থাকতেই হবে এমন কোন কথা নেই। একটি স্বতন্ত্র বাধি হিসাবে বাগির লক্ষণ হচ্ছে উরুসন্ধির স্ফীতি ও তা ’ পেকে ওঠা আর শরীরের বিভিন্ন অংশে , বিশেষ করে জননযন্ত্রে ক্ষত সৃষ্টি হওয়া। ডাক্তারী মতে উপদংশের বীজাণুর নাম " স্পাইরিলাম প্যালিডা ( spirillum pallida ) ও বাগির বীজাণুর নাম ব্যাসিলাস ডুকরে ( bacillus ducre ) ।

**কারণঃ** জননযন্ত্রকে অপরিচ্ছন্ন রাখা , অতিমৈথুন ও দূষিত নারী ও পুরুসঙ্গ এই রোগের কারণ। অতিমৈথুনের জন্যে সাধারণতঃ পতিতা নারীদের মধ্যে এই রোগের ব্যাপক প্রসার দেখা যায় ও তাদের থেকে সুস্থ পুরুষ দেহে এই রোগ সংক্রমিত হয়। তাই মোটামুটি বিচারে বলা যেতে পারে যে এই ব্যাধির সঙ্গে দুশ্চরিত্রতার অচ্ছেদ্য সম্পর্ক রয়েছে। রোগীর সঙ্গে অতিরিক্ত মেলামেশা করার ফলে রোগীর জামা কাপড় ব্যবহার করবার ফলে অথবা উচ্ছিষ্ট ভোজন করলে বা রোগীর সঙ্গে যৌন সম্পর্ক

থাকলে সুস্থ দেহে এই রোগ সংক্রমিত হতে পারে। তবে মেলামেশা বা আহারাদির ফলে এই রোগ সংক্রমণ বড় একটা দেখা যায় না ।

চিকিৎসাঃ ( আসন ও মুদ্রা )

প্রাতেঃ উৎক্ষেপ মুদ্রা , ময়ূরাসন , পদহস্তাসন , নাসাপান , শীতলীকুম্ভক

সন্ধ্যায়ঃ সর্বাঙ্গাসন , মৎসমুদ্রা, নৌকাসন , উৎকট পশ্চিমোত্তানাসন ও অগ্নিসার।

পথ্যঃ এই রোগে আমির খাদ্য , পেঁয়াজ , রসুন , অধিক মশলা , সর্বপ্রকার মিষ্টান্ন ও দুগ্ধজাত খাদ্য পরিহার করে চলা উচিত। সব রকমের ক্ষারধর্মী খাদ্য ও খাদ্য সুপথ্য। আহারের সময় দ্বিগ্রহরে ঘৃত সহ ভাত ও রাত্রে রুটি খাওয়াই বাঞ্ছনীয়। তরিতরকারীর ঝোল ও ফল - মূল যথেষ্ট পরিমাণে ব্যবহার করা যেতে পারে। রোগীর পক্ষে প্রত্যেহ যথেষ্ট পরিমাণে জল পান করা বিধেয়। রোগ না সারা পর্যন্ত দুগ্ধ পান না করাই ভাল। তবে রোগের মাত্রা হ্রাস পাবার সঙ্গে সঙ্গে দুগ্ধের মাত্রা বাড়ানো যেতে পারে।

**বিধি –** নিষেধঃ  রোগপ্রয় স্থানে শীত ও গ্রীষ্মে নির্দিষ্ট সময়ে রোদ লাগানো উচিত। প্রবাহ নিয়মিত ভাবে ক্ষতস্থান নিমপাতার কথে অথবা অন্য কোন বিষনাশক ঔষধের সাহায্যে উত্তম রূপে ধুয়ে ফেলার পর তাতে নিম তেল লাগিয়ে দেওয়া উচিত। ক্ষতস্থান ধৌত করার যতগুলি পদ্ধতি আছে তার মধ্যে একটি উত্তম পদ্ধতি হচ্ছে গিরিমাটি ভালো ভাবে গুঁড়ো করে নিয়ে ক্ষতস্থানের উপর তার প্রলেপ দিয়ে অতঃপর তার উপর ভিজে ন্যাকড়া দিয়ে রাখা। এইভাবে একটানা এক / দেড় ঘন্টা বার বার জল দিয়ে ন্যাকড়াটাকে ভিজিয়ে রাখার পরে গিরিমাটি সহ ন্যাকড়াটিকে সরিয়ে নেওয়া। এতে ক্ষত সুন্দরভাবে পরিষ্কৃত হয়ে

যায়।  মনে রাখা দরবার যে যে কোন চর্মরোগেই যে রস, রক্ত বা পুঁজ নির্গত হয়, বাহ্যিক ঔষধ প্রয়োগের দ্বারা সেগুলির নির্গম রোধ করা অত্যন্ত ক্ষতিকর।  তাই উপদংশ রোগে প্রথমের দিকে কোন রকমের বাহ্যিক মলম ব্যবহার না করাই উচিত।  রোগ

ভালভাবে ফুটে ওঠার পরেই নিম তেল বা অন্য কোন বাহ্যিক ঔষধ ব্যবহার করা যেতে পারে। এই রোগে উপবাসও অত্যন্ত হিতকর। একাদশী, পূর্ণিমা ও অমাবস্যা তিথিতে রোগীকে অবশ্যই উপবাসবিধি মেনে চলতে হবে। একটানা তিন/চার দিন উপবাস করলে ও উপবাসকালে কেবল নেবুর রস সহ জল পান করলে রোগটির আশু নিবৃত্তি ঘটে থাকে। রোগীর কখনই রাত্রে উদর পূর্ণ করে আহার করা চলবে না। রাত্রির আহার ৮টা/৮.৩০টা-এএর মধ্যে সেরে ফেলতে হবে। দিবানিদ্রা, রাত্রিজাগরণ, মানুষের ভীড়ে মেলামেশা প্রভৃতি বর্জন করে চলতে হবে। রোগমুক্তির পরেও দেড়-দুই বৎসর বিবাহ ও সহবাস বন্ধ রাখতে হবে। সর্ব প্রকারের মাদক দ্রব্য এই রোগীর পক্ষে বিষবৎ পরিত্যাজ্য।

কয়েকটি ব্যবস্থা:

(ক)

১) প্রদাহ স্থানে চূণ লেগন করে তারপর তার উপরে গুড় বা মধু লাগালে অতি অল্প সময়ের মধ্যে বাগি বসে যায়।

২) অপমার্গের (আপাং বা চড়চড়ে পাতার রসে ন্যাকড়া

ভিজিয়ে ওই ন্যকড়া শুকিয়ে প্রদাহযুক্ত স্থানের উপরে বেঁধে রাখলে

অথবা-

৩) ভূঁইচাপার গেঁড়ো জলে বেটে প্রলেপ দিলেও  অল্পায়াসে  বাগি বসে যায়।

৪) আ-ফলা হাতিগুঁড়ার পাতা জলে বেটে প্রলেপ দিলে বাগি বসে যায়, ওই শিকড়ের ছাল বেটে প্রলেপ দিলে পেকে যায় ও ফেটে

যায়, ও ওই ছাল পুড়িয়ে সেই ছাই তিল-তেলের সঙ্গে সাগালে ক্ষত

সেরে যায়।

(খ) উপদংশের ক্ষতঃ

৫) পাথরের বাটিতে কাঁচা সুপারি বেটে জিনিসটা চন্দনের মত হয়ে গেলে সেইটা প্রলেপ দিলে ক্ষত সেরে যায়।

৬) শাদা ধুনা অথবা ধূনার শানা অংশ ভালভাবে চূর্ণ করে মাখনের সঙ্গে মেড়ে জিনিসটা যখন কাদার মত হয়ে যাবে তখন তাকে জলে ধুয়ে আবার ভাল করে মেড়ে নিয়ে যখন নরম মলমের মত হয়ে যাবে তখন তা' ক্ষতে লাগাদে ক্ষত অতি অল্প কালের মধ্যেই শুকিয়ে যায়।

৭) শ্বেত করবীর মূল জলে ভালভাবে ঘসে চন্দনের মত করে নিয়ে ক্ষতস্থানে লাগালেও ক্ষত শুকিয়ে যায়।

(গ) উপদংশ ও পারা বিষ নাষ্ট করবার উপায়:

৮) প্রত্যহ প্রত্যুষে কুক্কীমার (কুকুর শোঁকার) রস এক ছটাক পরিমাণ পান করলে-

অথবা

৯) কলমীশাকের ডগা ছেঁচে প্রত্যহ প্রত্যুষে এক ছটাক মাত্রায় পান করলে, অথবা কৃষ্ণতুলসী রস প্রবাহ প্রত্যুষে ওই মাত্রায় পান করলে, অথবা গোমূত্রে অনন্তমূল সিদ্ধ করে এই মাত্রায় পান করলে উপদংশের বীজ বিনষ্ট হয়।

১০) এক আনা পরিমিত অপামার্গের শিকড় কাঁচা পেঁপের মধ্যে ভরে সিদ্ধ করে খেলে পারা ও উপদংশের বীজ দুইই নষ্ট হয়।

(খ) পারার দাগ।

১১) বুচকীদানা কৃষ্ণ গবীর মূত্রের সঙ্গে ঘসে প্রলেপ দিলে-

অথবা

১২) পেঁপের পাতা ও বেলের পাতা এক সঙ্গে বেটে লাগালে পারার দাগ দূর হয়ে যায়।

(ঙ) **উপদংশ বিষ নষ্ট করবার প্রকৃষ্ট পন্থা :**

১৩) পূর্ব দিন রাত্রে একটি পাথরবাটিতে এক ছটাক দই পেতে রেখে পরের দিন ভোরে খালি পেটে ওই দইয়ে এক ফোঁটা (রস যেন বেশী না হয়ে যায়) ত্রিশিরা সীজের (তেকাটা মনসা বা ন্যাড়া মনসা) রস মিশিয়ে সব দইটা খেয়ে নিতে হবে। দই খাবার খানিক পরেই রোগীর বমনোদ্রেক হবে ও বারবার দাস্ত হৰে কিন্তু এতে ভয় পাবার কিছুই নেই। চার-পাঁচ ঘণ্টা পরে স্নান করে এক গ্লাস মিছরির সরবৎ পান করলেই দাস্ত বন্ধ হয়ে যাবে। রোগী ওই দিন সন্ধ্যার দিকে কেবল জল-বার্লি খাবে ও তার পর কয়েক দিন খুব লঘুপাচ্য পথ্য গ্রহণ করবে। উপদংশ বিষ নষ্ট করবার এটি একটি প্রকৃষ্ট পন্থা।

**নিম তেল প্রস্তুত করবার প্রণালী:**

নিম পাতা ছেঁচে বা বেঁটে রস বের করে নাও। রসের পরিমাণ • যতখানি হ'ল (ধরা যাক ১ সের) তার অর্দ্ধেক পরিমাণ (এক্ষেত্রে তাহ'লে আধ সের) তিল-তৈল মিশিয়ে জ্বাল দাও। তৈলের পরিমাণ যতখানি ছিল জ্বাল দেবার পরে ততটুকু মাত্র অবশিষ্ট থাকতে জ্বাল দেওয়া বন্ধ করো। নজর রাখবে তেল যেন পুড়ে না যায়।

সূচীপত্র

# কর্‌কট রোগ (Cancer)

**লক্ষণঃ** আক্রান্ত স্থানে কাটা-ছেঁড়ার মত যন্ত্রণা, অতিরিক্ত অসহিষ্ণুতা বোধ, স্পর্শকাতরতা, দুর্বলতা, বমনেচ্ছা প্রভৃতি এই ব্যাধির প্রধান লক্ষণ। রোগটির প্রথম অবস্থায় রোগী বিশেষ

কোন যন্ত্রণা অনুভব করে না, তাই প্রথমের দিকে রোগটি প্রায়শই উপেক্ষিত হয়।

**কারণঃ** রোগটি সর্বদৈহিক তথা ত্রিদোষজ। বিভিন্ন কারণের একত্র

সমাবেশে এর উদ্ভব। সাধাণতঃ দেখা যায় স্বাস্থ্যবিধি প্রতিপালন না করার ফলে যারা কোষ্ঠকাঠিন্যে ভোগে, তৎসহ যদি অলসতা, অসংযম, দিবানিদ্রা বা রাত্রিজাগরণের অভ্যাস থাকে, তারাই এই ব্যাধিতে অধিক সংখ্যায় আক্রান্ত হয়। কোষ্ঠকাঠিন্যের ফলে রক্ত তথা দেহতন্ত্ব দূষিত পাচক রসে ও তদুদ্ভূত দূষিত বায়ুতে জর্জরিত হয়ে পড়লে এই রোগ প্রকাশ পায়। যারা অসংযমী তাদের দেহযন্ত্রের কতকগুলি অংশ দুর্বল হয়ে পড়ে ও অতিরিক্ত শুক্রক্ষয়ের ফলে রক্ত নিঃসার হয়ে যায়। এইরূপ মানুষ অতিরিক্ত আমিষ গ্রহণ করলে রক্ত অম্লবিষপ্রধান হয়ে পড়ে ও দেহের দুর্বল অংশে ধীরে ধীরে রোগ ফুটে ওঠে।

যারা শারীরিক পরিশ্রম করে না অথচ অম্লধর্মী খাদ্য বা লঙ্কা অথবা মাদকদ্রব্য, বিশেষ করে তামাকজাত দ্রব্যের অধিক ব্যবহার করে থাকে তাদেরও দেহের দুর্বল অংশ এই রোগে আক্রান্ত হবার সমূহ সম্ভাবনা থেকে যায়।

চিকিৎসা : রোগী যে কারণে রোগগ্রস্ত হয়ে পড়েছে সেই কারণগুলি বুঝে তদনুযায়ী আসন-মুদ্রার ব্যবস্থা দিতে হবে। এই রোগে  অধিকাংশ ক্ষেত্রে কোষ্ঠকাঠিন্য থেকে থাকে। তাই কোষ্ঠ পরিষ্কারের দিকে বিশেষ নজর রাখতে হবে।

প্রত্যূষে:

উৎক্ষেপ মুদ্রা, নাসাপান, দীর্ঘপ্রণাম, যোগমুদ্রা, ভুজঙ্গাসন ও কর্কট প্রাণায়াম।

দ্বিপ্রহরে:

উৎক্ষেপমুদ্রা ও নাসাপান বাদে প্রত্যূষের অনুরূপ।

সন্ধ্যায়:

মৎস্যেন্দ্রাসন, পদহস্তাসন, শয়নবজ্রাসন ও কর্মাসন।

রোগী যদি এই চারটি আসনে অপারগ হয় তবে সেক্ষেত্রে সর্বাঙ্গাসন, মৎস্যমুদ্রা, নৌকাসন ও পশ্চিমোত্তানাসন অভ্যাস করবে। রোগী এতেও অপরাগ হ'লে দ্বিপ্রহরের অনুরূপ। প্রত্যহ ব্যাপক স্নানও রোগীর অবশ্য করণীয়; শরীরে সহ্য হ'লে দ্বিপ্রহর ও সন্ধ্যা দু'বেলায় স্নান করা যেতে পারে।

পথ্য: রক্তের অম্লভাগ কমাবার জন্যে ও যকৃতের কাজ ঠিক

ভাবে চালু রাখবার জন্যে রোগীকে যতদূর সম্ভব ক্ষারধর্মী খাদ্য অর্থাৎ সর্ব প্রকার ফল-মূল, শাক-সব্জীর ঝোল প্রভৃতি খেতে হবে। যকৃতের অবস্থা বুঝে যথেষ্ট পরিমাণে দুধও রোগীকে গ্রহণ করতে

হবে। যকৃৎ যাদের খারাপ তারা গোদুগ্ধের পরিবর্তে নারকোল বা বাদামের দুধ অথবা ঘোল ব্যবহার করৰে। রাত্রের আহার আট ঘটিকার মধ্যে সেরে ফেলতে হৰে। দু'বেলায় আহারান্তে ঘণ্টা খানেক দক্ষিণ নাসা প্রবাহিত রাখতে হবে। দৈনিক প্রায় আড়াই সের জল রোগীর পান করা উচিত, তবে 'কখনও এক সঙ্গে আধ পোয়ার অধিক নয়। আনারস, জাম, কলা ও অন্যান্য সব রকমের নেবু ও টমেটো এই রোগে আহার ও ঔষধ দুই-ই।

বিধি-নিষেধ: কর্কট রোগীর পক্ষে আতপস্নান অত্যন্ত হিতকর। প্রত্যহ ব্রাহ্ম মুহূর্তে ও গ্রীষ্মকালে সকাল ন'টা থেকে দশটা-এগারটার - মধ্য পর্যন্ত ও শীতকালে দুপুর বারটা পর্যন্ত আতপস্নান করা উচিত। আতপস্নানের পর ভিজে গামছার সাহায্যে সর্বাঙ্গ অবশ্যই মুছে ফেলা  উচিত। সর্বাঙ্গে মাটি মেখে প্রত্যহ নদীতে অবগাহন করলেও এই রোগে বেশ ভাল ফল পাওয়া যায়। রোগীর পক্ষে দিবানিদ্রা, রাত্রিজাগরণ, লঙ্কা, আমিষখাদ্য ও মৈথুন কঠোরভাবে পরিত্যজ্য। সামর্থ্যমত উন্মুক্ত স্থানে ভ্রমণ ও যে সকল রোগী স্বভাবগতভাবে অলস তাদের পক্ষে কিছুটা

শারীরিক পরিশ্রমও করা দরকার। কোষ্ঠ পরিষ্কার রাখার জন্যে আহারান্তে হরীতকীর ব্যবহার বিধেয়।

রোগী যাতে প্রত্যুষেই শয্যা ত্যাগ করতে পারে তজ্জন্য রাত্রি ৮.৩০টা/৯টার মধ্যে শয়ন করা বাঞ্ছনীয়।

সূচীপত্র

# কুষ্ঠ

লক্ষণ : সংস্কৃত ভাষায় 'কুষ্ঠ' শব্দের অর্থ চর্মরোগ। সে বিচারে ঘামাচিও কুষ্ঠ। কিন্তু সাধারণতঃ আমরা কুন্ঠ বলতে যা' বুঝি সংস্কৃত ভাষায় তাকে বলা হয় বাতরক্ত রোগ। এই রোগটি সপ্তধাতুর বিকৃতির ফলে সৃষ্টি হয় অর্থাৎ যে ক্ষেত্রে রস, রক্ত,

মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা ও শুক্র এই সপ্ত ধাতু দোষযুক্ত হয়ে পড়ে কেবল সেই ক্ষেত্রেই এই বাতরক্ত ব্যাধি প্রকট হয়ে ওঠে।

এই রোগটি সাধাণতঃ তিনটি স্তরে বিভক্ত। প্রথমাবস্থায় রোগী সর্ব শরীরে অস্বস্তি বোধ করে; অস্থি সন্ধিতে ব্যথা বোধ করে, সময়ে অসময়ে জ্বর -জ্বর ভাব থাকে, প্রায়ই মাথার যন্ত্রণা হয়, কখনো অতিরিক্ত ঘর্ম, আবার কখনো ঘর্মের অভাব দেখা যায়, রোগী দুর্বলতাও বোধ করে। রোগের দ্বিতীয় স্তরে রোগী স্নায়ুতন্তুসমূহে সূচীবেধবৎ যন্ত্রণা অনুভব করে। শরীরের কোন কোন অংশে কখনো কখনো ছোট ছোট ফুসকুড়ি দেখা দেয়। মাথা ও ভ্রূর কেশ, লোম ঝরে পড়ে; ঠোঁট, গাল, নাক ও চোখের কোন অংশ সঙ্কুচিত, কোন অংশ প্রসারিত হয়ে মুখ ফুলে উঠতে পারে; হাত-পায়ের অংশবিশেষও ফুলে উঠতে পারে। কখনও কখনও রোগী চলবার সময়ে অনুভব করে যে তার পায়ের নীচে শক্ত কিছু বিঁধেছে। রোগের এই অবস্থায় গ্রাম্য ভাষায় কুল-আঁটি রোগ বলা হয় অর্থাৎ রোগী মনে করে যেন তার পায়ের তলায় কুল- আঁটি বিঁধেছে। রোগের তৃতীয় অবস্থায় রোগীর শরীরের

বিভিন্ন অংশে লাল-লাল চাকা-চাকা দাগ দেখা দেয় ও ক্রমশঃ সেই স্থানগুলি অসাড় হয়ে যায়।

কারণ : পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে, যথেষ্ট পরিমাণ সবুজ

আনাজপাতির অভাবে ও দুগ্ধ, ঘৃত প্রভৃতি স্নেহপদার্থের দিনের পর দিন

অভাব ঘটতে থাকলে রক্ত অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়ে। এই অবস্থায় মানুষ

যদি আমাশয় বা কোষ্ঠবদ্ধতা রোগ সৃষ্টিকারী খাদ্য দীর্ঘ কাল ধরে গ্রহণ

করতে থাকে অথবা অধিক পরিমাণে পচা মৎস্য, মাংস, গেঁড়ি, গুগলী

বা অত্যধিক পরিমাণে বিলাতী কুমড়া (ডিংলে বা সূয্যি কুমড়া), ঝিঙে

বা শাদা বেগুন ভক্ষণ করে, সেক্ষেত্রে এই রোগ নিজেকে বিস্তার

করবার বিশেষ সুযোগ পেয়ে যায়। রক্ত থেকে ক্রমশঃ বাকী ছ'টি ধাতু

দূষিত হতে থাকে কারণ রক্তের দুষ্টির ফলে দেহের প্রতিটি গ্রন্থিই দুর্বল

হয়ে যায় ও সপ্ত ধাতুর বিকৃতির ফলে মানুষ তার রোগ-

প্রতিরোধশক্তিও হারিয়ে ফেলে। দীর্ঘ দিন ধরে শ্বেতকণিকা ও

রোগজীবাণুর সংগ্রামের পরিণামস্বরূপ মেদ, মাংস, রক্ত ও রস নিঃসার

হয়ে গেলে দেহের শেষাংশগুলিও শিথিল হয়ে যায় ও তাই রোগীর

দেহের শেষাংশগুলি খসে খসে পড়তে থাকে।

চিকিৎসা: (আসন ও মুদ্রা)

প্রত্যুষে: উৎক্ষেপমুদ্রা, পদহস্তাসন, অগ্নিসার, উড্ডয়ন, নৌকাসন ও শীতলীকুম্ভক করে রোগগ্রস্ত অংশ মর্দন

করবে। সন্ধ্যায়: উড্ডয়ন, অগ্নিসার, বন্ধত্রয়যোগ, সর্বাঙ্গাসন, ময়ূরাসন।

পথ্য! রোগী কঠোরভাবে আমিষ বর্জন করবে। নিজের যকৃতের সামর্থ্য অনুযায়ী সব রকমের পুষ্টিকর নিরামিষ খাদ্য গ্রহণ করবে। ঘৃত, মাখন অথবা জলপাইয়ের তেল- এদের একটি-না-একটি প্রাত্যহিক ভোজনের তালিকায় অবশ্যই থাকা উচিত।

রোগী যথেষ্ট পরিমাণে (আন্দাজ ৪/৫ সের, তবে এক সঙ্গে অধিক নয়) জল পান করবে ও উপবাসবিধি মেনে চলৰে।

বিধি-নিষেধ: কুষ্ঠরোগীর পক্ষে আতপস্নান অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

রোগীর পক্ষে নদীমৃত্তিকা সর্বাঙ্গে প্রলেপ দিয়ে অবগাহন স্নান করা বাঞ্ছনীয়। যতদূর সম্ভব ফল-মূল, দুগ্ধ ও তরিতরকারীর ঝোল খেয়েই দিন কাটাতে হৰে। লোভকে প্রশ্রয় দিলে চলবে না। পাঁচ জনের ভীড়ের মধ্যে থাকা, অতি ভোজন, মাদক দ্রব্যের ব্যবহার ও স্ত্রীসঙ্গ কঠোরভাবে বর্জন করতে হবে।

কুষ্ঠরোগ কোন সংক্রামক রোগ নয়। সুতরাং হাতে করে রোগীর রস, রক্ত স্পর্শ করলে রোগ সংক্রমিত হবে না। রোগীর রস, রক্ত যতক্ষণ না সুস্থ রক্তে মিশবার সুযোগ পাচ্ছে অথবা রোগীর উচ্ছিষ্টের মাধ্যমে বা শ্বাস-প্রশ্বাসের মাধ্যমে রোগবীজাণু সুস্থ মানুষের উদরে প্রবেশ করছে ততক্ষণ এই রোগ বিস্তারের কোন সম্ভাবনাই থাকে না। কুষ্ঠ প্রধানতঃ দরিদ্রের রোগ। তাই জনসাধারণ যতদিন না যথেষ্ট পরিমাণ পুষ্টিকর খাদ্য পাচ্ছে

ততদিন এই রোগের প্রসার সম্পূর্ণ বন্ধ করা সম্ভব নয়। রোগীর পক্ষে উচ্ছের ফল বা পাতা (করলার গুণ কিছুটা কম), পলতা, নিম, শোভাঞ্জনের (শোজনে বা শাজনা) ফুল, পাতা ও ডাঁটা প্রভৃতি কোন একটি প্রাত্যহিক ভোজন তালিকায় থাকা দরকার। হেলেঞ্চা, গিমা, ব্রাহ্মী প্রভৃতি শাকেরও যে কোন একটি প্রত্যহ ব্যবহার করা উচিত।

কয়েকটি ব্যবস্থা:

১) প্রত্যহ কিঞ্চিৎ পরিমাণ হরীতকীচূর্ণ গুড় সহ লেহন করে খেলে এই রোগ প্রশমিত হয়।

২) ৩টি বা ৫টি হরীতকী খণ্ড ভোজন করে অতঃপর গুলঞ্চের ক্বাথ পান করলে-

অথবা

৩) নিমছালের ক্বাথ ও পলতার কাথ একত্রে মিশিয়ে পান করলে কুষ্ঠ রোগ দূরীভূত হয়।

৪) রোগগ্রস্ত স্থানে নিমপাতার পুলটিস দিলেও ভাল ফল পাওয়া যায়।

৫) গুলঞ্চের ক্বাথ পান করার পরে ওই ক্বাথ জীর্ণ হয়ে গেলে ঘৃত সহ অন্ন গ্রহণ করলেও কুষ্ঠ রোগে সুফল পাওয়া যায়।

৬) গোমূত্র সহ হরিদ্রা এক মাস প্রত্যুষে প্রত্যহ পান করলে এই রোগ থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়।

সূচীপত্র

# কৃশতা

কারণ: শারীরিক কৃশতার কারণ নানাবিধ :

১) দুর্বল বা অসুস্থ পুং বা স্ত্রীৰীজ থেকে যে সকল শিশুর দেহ সৃষ্টি হয়েছে, তারা স্বাভাবতই শক্তিহীন ও কৃশকায় হয়ে থাকে।

২) শিশু যদি যথেষ্ট পরিমাণে মাতৃস্তন্য না পায় সেক্ষেত্রেও সে সাধারণতঃ কৃশকায় হয়ে থাকে।

৩) দারিদ্র্য নিবন্ধন যে সকল পিতা-মাতা সন্তান-সন্ততিদের জন্যে যথেষ্ট পরিমাণে দুগ্ধের ব্যবস্থা করতে পারেন না ও অল্প বয়স থেকে তাদের জন্যে ভাত, ডাল বা সাবু-বার্লির ব্যবস্থা দেওয়া হয়, তাদের যকৃৎ ও পরিপাক যন্ত্রগুলি দুর্বল হয়ে পড়ে ও অধিকাংশ ক্ষেত্রে তারা কৃশকায় হয়ে পড়ে।

৪) যে সকল পিতা-মাতা সন্তানের প্রতি অতিরিক্ত দরদ দেখাতে গিয়ে শিশুকাল থেকেই তাদের জন্যে ঘৃত, মাখন, মাছ, মাংস, ডিমের ব্যবস্থা দেন অথবা দারিদ্র্যের জন্যে বা সংস্কারের বশে যাঁরা শিশুকে - দুগ্ধ, ফল-মূল প্রভৃতি শিশুর পক্ষে হিতকর খাদ্যের

পরিবর্তে আমিষ খাদ্য বা মশলাযুক্ত তরিতরকারীর ব্যবস্থা করেন সেই সকল শিশুও যকৃৎ, পাকযন্ত্র প্রভৃতির অতিক্রিয়তার ফলে যন্ত্রগুলির সৰলতা হারিয়ে ফেলে ও কৃশকায় হয়ে যায়।

প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের মধ্যে কৃশতা সাধারণতঃ নিম্নলিখিত কারণগুলির ফলে সৃষ্ট হয়:-

১) অতিরিক্ত মানসিক পরিশ্রম, '

২) যৌনগ্রন্থির দুর্বলতা,

৩) কোষ্ঠবদ্ধতা,

৪) অম্লরোগ,

৫) কোন দীর্ঘস্থায়ী রস-রক্তক্ষয়ী ব্যাধি,

৬) পুরুষ ব্যাধি বা স্ত্রীব্যাধি।

চিকিৎসা: শিশুদের কৃশতায়-

প্রত্যূষে: কর্মাসন,

ভুজঙ্গাসন, শলভাসন, গরুড়মুদ্রা ও আগ্নেয়ীমুদ্রা।

সন্ধ্যায়: সমকোণ আসন, চক্রাসন, গ্রন্থিমুক্তাসন।

বয়স্কদের যে মূল ব্যাধির ফলে কৃশতা দেখা দিয়েছে সেই ব্যাধিটির যথাযথ চিকিৎসা করলে প্রয়োজন মত মেদ-মাংসাদির সঞ্চয় হবে। রোগীর পক্ষে অবশ্যই যথেষ্ট পরিমাণে (আন্দাজ ৪/৫ সের, কিন্তু এক সঙ্গে অধিক নয়) জলপান ও আতপস্নান বিধেয়। রোগীর পক্ষে যথেষ্ট পরিমাণে উন্মুক্ত স্থানে প্রাকৃতিক পরিবেশে থাকা বাঞ্ছনীয়। কৃশ শিশুদের খেলাধূলাতেও উৎসাহ দেওয়া উচিত।

পথ্য: পাঁচ বৎসরের কমবয়স্ক বালক-বালিকার প্রধান খাদ্য দুগ্ধ

ও ফল-মূল। শ্বেতসার, শর্করা ও স্নেহজাতীয় খাদ্য যত কম দেওয়া যায় ততই মঙ্গল কারণ ওই সকল খাদ্য শিশুর অপরিণত যকৃৎ ও পরিপাক যন্ত্রগুলিকে দুর্বল করে দেয়। পাঁচ বৎসর বয়সের পূর্ব পর্যন্ত কোন অবস্থাতেই শিশুকে আমিষ খাদ্য দেওয়া উচিত নয়। পাঁচ বছর বয়সের পর থেকে ধীরে ধীরে শ্বেতসার, শর্করা ও স্নেহজাতীয় খাদ্যের পরিমাণ বাড়িয়ে দেওয়া যেতে পারে। ফল-মূল প্রভৃতি ক্ষারধর্মী খাদ্যই শিশুর পক্ষে চেয়ে হিতকর। দারিদ্র্য নিবন্ধন অনেকে শিশুদের জন্যে যথেষ্ট পরিমাণ দুগ্ধের ব্যবস্থা দিতে পারে না অথচ শিশুদের জন্যে প্রয়োজন দৈনিক অন্ততঃ পক্ষে তিন পোয়া/এক সের দুধ।

**বিধি-নিষেধ:** ফল-মূল, শাক-সব্জীর ঝোল ও দুগ্ধ যথেষ্ট

পরিমাণে খেতে পেলে শিশুদের কৃশতা দূর হয়ে যায় কিন্তু দুঃখের বিষয়, অতিলোভী আমিষভোজী অভিভাবকগণ আর্থিক সামর্থ্য

থাকা সত্ত্বেও সন্তান-সন্ততিকে তাদের প্রয়োজনীয় খাদ্য থেকে বঞ্চিত করে মাছ, ডিম, ঘি, মাখন প্রভৃতি খেতে দেন। এধরণের স্বভাব অত্যন্ত ক্ষতিকর। প্রাপ্তবয়স্কদের ক্ষেত্রে সাধারণতঃ কৃশতার মূলীভূত কারণ যে ব্যাধিতে নিহিত সেই ব্যাধিটি দূর হবার সঙ্গে সঙ্গে কৃশতাও আর থাকে না। নিজের যকৃৎ ও পাকযন্ত্রের অবস্থা বুঝে প্রাপ্তবয়স্ক কৃশকায় ব্যষ্টিরা যথেষ্ট পরিমাণে পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ করলে, যথেষ্ট শারীরিক পরিশ্রম করলে, বিধিমত জলপান ও স্নানান্তে সিক্তমর্দনের ব্যবস্থা করলে অল্প দিনের মধ্যে হৃষ্টপুষ্ট হয়ে উঠতে পারেন।

সূচীপত্র

# গরল ও কাউর (Eczema)

লক্ষণ: ক্ষত থেকে রসস্রবণ, চুলকানি, জ্বালাপোড়া ও দপদপানির ভাব, প্রতি বৎসরই রোগের পুনরুদয়, রোগজনিত শারীরিক

দুর্বলতা ও মধ্যে জ্বর, সময় সময় রোগের অতি প্রকোপের ফলে দেহের অস্থি পর্যন্ত বেরিয়ে আসা এই রোগের লক্ষণ।

কারণ: রস, রক্ত, মাংস ও মেদ এই চার ধাতুর বিকৃতির ফলে এই

রোগ উৎপন্ন হয়। তাই এই রোগটি শ্বিত্র বা শ্বেতকুষ্ঠ অপেক্ষাও ক্ষতিকর। রক্তের দুর্বলতার ফলে (এই দুর্বলতার কারণ সর্ব ক্ষেত্রে না হোক, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আমাশয়, বিশেষ করে তা' যদি ধারক ঔষধ ব্যবহার করে নিরুদ্ধ করা হয়ে থাকে) চর্মের সঙ্গে মাংস ও মেদও যখন দুর্বল হয়ে পড়ে ও তাদের রোগ প্রতিরোধ শক্তিও হারিয়ে ফেলে, তখনই রোগৰীজাণু শরীরে বাসা বাঁধবার সুযোগ পায়। রক্তের শ্বেতকণিকা এই রোগৰীজাণুর সঙ্গে অক্লান্তভাবে সংগ্রাম চালিয়ে যেতে থাকে ও এই সংগ্রামেরই পরিণাম স্বরূপ রোগৰীজাণু ও শ্বেতকণিকাসমূহের মৃতদেহ পুঁজ রূপে অথবা রস- রক্তের সঙ্গে দেহ থেকে নির্গত হতে থাকে। এই পুঁজ-রস-রক্তাদির নির্গমন শরীরের বেশ কিছুটা ভেতর থেকে হয়ে থাকে বলে রোগী অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করে থাকে।

চিকিৎসা:

প্রত্যূষে : দীর্ঘপ্রণাম, যোগমুদ্রা, ভুজঙ্গাসন, অগ্নিসার, পদহস্তাসন ও শীতলীকুম্ভক।

সন্ধ্যায়: মৎস্যেন্দ্রাসন, শয়নৰজ্রাসন, কুর্মকাসন।
পথ্য: মিষ্ট দ্রব্য ও আমিষ ব্যতিরেকে সব রকমের লঘুপাচ্য পুষ্টিকর খাদ্যই রোগী গ্রহণ করতে পারে। রোগীর অবশ্যই যথেষ্ট পরিমাণ জল পান করা উচিত। একাদশী, পূর্ণিমা, অমাবস্যা তিথির উপবাস বিধি মেনে চলা দরকার।

বিধি-নিষেধ: আমাশয় বা কোষ্ঠকাঠিন্য দেখা দিতে পারে এরূপ

সকল খাদ্যই রোগীকে বর্জন করতে হবে। প্রত্যহ রোগগ্রস্ত জায়গায় রোদ লাগানো বিশেষ প্রয়োজন। রোগ সম্পূর্ণ রূপে

দূরীভূত না হওয়া পর্যন্ত আমিষ খাদ্য ও মাদক দ্রব্যের লোভ সংবরণ করে চলতে হবে।

কয়েকটি ব্যবস্থা:

১) শ্বেত করবীর মূল জলে ঘসে চন্দনের মত করে প্রলেপ দিলে,

অথবা

২) কাঁচা হলুদের রস ও দই এক ছটাক পরিমাণ মিশিয়ে খেলে এই রোগে সুফল পাওয়া যায়। ৩) নারিকেল তৈলের সঙ্গে মুসব্বর মিশিয়ে প্রলেপ দিলে,

অথবা

৪) পূর্ব দিন রাত্রে পিত্তলপাত্রে চূণ ও নারিকেল তেল এক সঙ্গে রেখে দিয়ে পরদিন ওই চূণ ও তেল ফেনিয়ে নিয়ে রোগগ্রস্ত স্থানে প্রলেপ দিলে আশু উপকার পাওয়া যায়।

৫) গন্ধক ও রান্নাঘরের ঝুল নারিকেল তেলে মেড়ে প্রলেপ দিলে,

অথবা

৬) কেলেকোঁড়া পাতা হুঁকোর কটু জলে বেটে গরলের উপর ঘসে লাগালে ভীষণ ধরণের গরলেও উপকার পাওয়া যায়। গরলযুক্ত স্থান নারিকেল তৈল বা গব্য ঘৃতসহ পান দিয়ে বেঁধে রাখা বাঞ্ছনীয়।

সূচীপত্র

# ধাতুদৌর্বল্য

লক্ষণ: প্রস্রাবের পূর্বে বা পরে শুক্র নির্গমন, সামান্য উত্তেজনা বা কামচিন্তায় শুক্রস্খলন, নারী দর্শনে, নারীচিন্তনে বা নারীচিত্র দর্শন করে শুক্রস্খলন, স্মরণ শক্তির অভাব, মাথার যন্ত্রণা, পায়ের দুর্বলতা (বিশেষ করে হাঁটুতে) এই রোগের লক্ষণ।

কারণ: যৌনজ্ঞানের অভাবে কৈশোরে বা প্রথম যৌবনে অস্বাভাবিক উপায়ে শুক্রক্ষয়, বিবাহিত জীবনে অসংযম, অল্প বয়স থেকে অতিরিক্ত আমিষ বা মাদক দ্রব্যের ব্যবহার, শারীরিক পরিশ্রমের অল্পতা ও মানসিক পরিশ্রমের আধিক্য, উপবাসবিধি, স্নানবিধি, জলপান বিধি ও আতপস্নান বিধি না মেলে চলা এই রোগের কারণ।

চিকিৎসা: চিকিৎসা, পথ্য ও বিধিনিষেধ “যৌন অক্ষমতা ও

ক্লীবতা ব্যাধি”-র অনুরূপ। কুচিন্তা, মাদক দ্রব্য ও আমিষের ব্যবহার সর্বতোভাবে পরিত্যজ্য। কামোদ্দীপক চিত্র বা সবাক চিত্র দর্শন, অশ্লীল সাহিত্য পাঠ প্রভৃতি বর্জন করে চলতে হবে।

কয়েকটি ব্যবস্থা:

১) এক ইঞ্চি পরিমাণ তুলসীর শিকড় পাণ সহ উত্তম রূপে চর্বণ করে খেলে দুই এক সপ্তাহের মধ্যে এই ব্যাধিতে উত্তম ফল পাওয়া যায়।

২) সুপুষ্ট শিমূল মূল ছায়ায় শুকিয়ে উত্তম রূপে চূর্ণ করে দুগ্ধ. সহ চার আনা পরিমাণ ওই চূর্ণ প্রত্যহ প্রত্যুষে সেব্য।

# পক্ষাঘাত

মানুষের দেহ রূপী যন্ত্রের আপাতনিয়ন্তা তার মস্তিষ্ক। সংজ্ঞা ও

আজ্ঞা নাড়ীর সাহায্যে মস্তিষ্কই বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ থেকে ভাব গ্রহণ ও সঞ্চালন করে থাকে। এই মস্তিষ্ক রূপী স্নায়ুকেন্দ্র আবার দক্ষিণ ও বাম ভেদে মোটামুটি দু'টি অংশে বিভক্ত। দক্ষিণ মস্তিষ্কস্থ স্নায়ুপুঞ্জ দেহের বাম অংশ বা বামপক্ষকে নিয়ন্ত্রণ করে ও বাম মস্তিষ্কস্থ স্নায়ুপুঞ্জ দেহের দক্ষিণ অংশ বা দক্ষিণ পক্ষকে নিয়ন্ত্রণ করে। রক্তের চাপে বা অন্য কোন কারণে মস্তিষ্কের কোন একটি অংশের স্নায়ুপুঞ্জ ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়লে সেই অংশ কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত দেহাংশ বা পক্ষ নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। দেহাংশবিশেষের এই যে নিষ্ক্রিয়তা একেই বলা হয় পক্ষাঘাত বা পক্ষবধ রোগ।

কারণ: মস্তিষ্কের এক একটি বিশেষ অংশ সংজ্ঞা নাড়ীর সাহায্যে

এক একটি বিশেষ ভাব গ্রহণ করে। রক্তের চাপে অথবা অন্য কোন আঘাতে মস্তিষ্কের ওই অংশ বা স্নায়ুকোষ বিকৃত হয়ে পড়লে অথবা স্নায়ুকোষ বা স্নায়ুতন্তু ছিন্ন হয়ে গেলে বা সংজ্ঞা নাড়ী (যে কোন অঙ্গ- প্রত্যঙ্গেই হোক না কেন) ত্রুটিযুক্ত হয়ে পড়লে সংজ্ঞাভাব জীবমানসে পৌঁছায় না। স্নায়ুর ত্রুটি বা বিচ্ছিন্নতা

নিৰন্ধন সেই অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও উত্থানশক্তিরহিত হয়ে যায়। অনুরূপ ভাবে যে আজ্ঞা নাড়ীর সাহায্যে মস্তিষ্ক ভাব-সঞ্চালন করে থাকে সেই আজ্ঞা নাড়ীতে কোন বিকৃতি এসে গেলে বা তার পরিচালক স্নায়ুকোষে কোন ত্রুটি দেখা গেলে, অঙ্গ- প্রত্যঙ্গের সঙ্গে মস্তিষ্কের স্নায়ুকোষ বিচ্ছিন্ন হওয়ার ফলেও সংশ্লিষ্ট দেহাংশে পক্ষাঘাত রোগ দেখা দেয়। এক্ষেত্রে মনে রাখা দরকার যে মস্তিষ্কের যে কোষ যে ভাবের গ্রাহক বা বাহক, তার ত্রুটিতে কেবলমাত্র সেই অঙ্গই পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে যায় বা সেই বোধই নষ্ট হয়ে যায়। সেই জন্যে এমনও দেখা যায় যে একই ব্যষ্টি যিনি সংস্কৃত ও ইংরেজী দু'য়েতেই পণ্ডিত তাঁর মানসিক পক্ষাঘাতের ফলে (স্মৃতিভ্রংশ) হয়তো বা সংস্কৃত জ্ঞান নষ্ট হয়ে গেছে কিন্তু ইংরেজী জ্ঞান অটুট রয়েছে। পক্ষাঘাত রোগটি যে সব সময়েই সম্পূর্ণ বাম অংশে হৰে বা সম্পূর্ণ দক্ষিণাংশে হবে এমন কোন কথা নেই। পূর্ববর্ণিত কারণ অনুযায়ী দেহের দক্ষিণাংশের বা বামাংশের কোন একটি বিশেষ অঙ্গেও এই ব্যাধি সীমিত থাকতে পারে। যেমন দক্ষিণ চক্ষু পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে গেছে, ৰাম চক্ষু ঠিক আছে, আবার দক্ষিণ মাড়ী পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে গেছে কিন্তু বাম মাড়ী ঠিক আছে।

যে সমস্ত কারণে রক্তচাপজনিত রোগ সৃষ্টি হয় পক্ষাঘাত রোগটিও প্রায়শঃ সেই সকল কারণেই উৎপন্ন হয়। কারণ, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই স্নায়বিক ত্রুটি রক্তের চাপেই সংঘটিত হয়, কিন্তু এ ছাড়াও এ ব্যাধির আরও দু'-একটি কারণ আছে। যেমন, যারা অতিলোভী বা ঔদরিক অথবা যারা অত্যধিক আমিষভক্ত তাদের রক্ত অম্লবিষে জর্জরিত হয়ে গেলে সেই বিষ অনেক সময় স্নায়ুতন্তুকে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে দিয়ে পক্ষাঘাত রোগগ্রস্ত করে দেয়। যে সকল লোকের মণিপুর চক্র অতিক্রিয় তাদের মধ্যে কাম-ক্রোধাদি বৃত্তির প্রাবল্য দেখা দেয়। ওই সকল ব্যষ্টিরা বেশ কর্মতৎপরও হয়ে থাকে, কিন্তু ক্রোধাধিক্য ও কামাধিক্য নিবন্ধন এরা প্রায়ই কোষ্ঠকাঠিন্যে ভুগে থাকে। এই সকল পিত্তপ্রধান ধাতুর লোকেরা জীবনে যদি কোন মহৎ আদর্শ না পায়, সেক্ষেত্রে কাম ও ক্রোধ রিপুর অতি সেবার ফলে তাদের দেহের নিম্নাংশ দুর্বল হয়ে যায় ও অনেক সময় দেহের নিম্নাংশের স্নায়ুতন্তু ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়ে সেখানে পক্ষাঘাত রোগ সৃষ্টি করে। এই সকল পিত্তপ্রধান ধাতুর যে সকল রোগী জীবনে উচ্চ আদর্শ পেয়ে থাকে তারা দেহের ঊর্ধ্বাংশের অতিক্রিয়তা নিবন্ধন দেহের ঊর্ধ্বভাগে

পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে পড়ে। মনে রাখা দরকার যে এই ব্যাধির সঙ্গে কোষ্ঠকাঠিন্যের অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অতি নিকট সম্বন্ধ থাকে।

চিকিৎসা:

প্রত্যুষে: উৎক্ষেপমুদ্রা, দীর্ঘপ্রণাম, যোগমুদ্রা, ভুজঙ্গাসন (অথবা এই তিনটি আসনের মধ্যে যেটি করা সম্ভব), পক্ষবধ প্রাণায়াম।

সন্ধ্যায়: সকালের অনুরূপ।

পথ্য: এই ব্যাধিতে ক্ষার জাতীয় দ্রব্য অর্থাৎ ফল-মূল, শাক-সব্জীর ঝোল ও যথেষ্ট পরিমাণে নেবুর রস গ্রহণ করা বিধেয়। রোগের বাড়াবাড়ি অবস্থায় নেবুর রস সহ স-অম্বু উপবাসই একমাত্র করণীয়। দৈনিক প্রায় সাড়ে চার সের জল রোগীর পক্ষে পান করা উচিত, তবে কখনও এক সঙ্গে আধ পোয়ার অধিক নয়।

বিধি-নিষেধ: আমিষাহার, মৈথুন, মাদক দ্রব্যের ব্যবহার,

দিবানিদ্রা, রাত্রিজাগরণ প্রভৃতি কঠোরভাবে বর্জনীয়। ব্যাপক স্নান এই রোগে অত্যন্ত হিতকর। গ্রীষ্মে ও শীতকালে নির্দিষ্ট সময়ে আতপস্নানও রোগীকে করতে হবে। প্রথমে সর্বাঙ্গে আতপস্নান করে অতঃপর ভিজে তোয়ালে দিয়ে সর্বাঙ্গ মুছে নিয়ে তারপর কেবলমাত্র রোগগ্রস্ত দেহাংশেই আতপস্নান করতে হবে। একটানা ১৫/২০ মিনিট ধরে এই রকমভাবে রোগগ্রস্ত অঙ্গে দু'/তিনবার আতপস্নান করবার পরে সর্বশেষে ওই অঙ্গে উত্তম রূপে মর্দনক্রিয়া করে নিতে হবে (তৈলসহ বা শুষ্ক)।

পাকস্থলীর ক্ষত ও আন্ত্রিক ক্ষত (ডেওডেন্যাল আলসার ও গ্যাসট্রিক আলসার)

লক্ষণ: অজীর্ণ ও কোষ্ঠবদ্ধতা, অরুচি, আহারের পরে বমনেচ্ছা, আহারের পরক্ষণে বা দু'/একঘণ্টা পরে পেটে যন্ত্রণা বোধ হওয়া—এই গুলি রোগের লক্ষণ।

কারণ: পাকস্থলীর অর্ধজীর্ণ খাদ্য বা খাদ্যরস অধিকতর জীর্ণত্বের

জন্যে ঊর্ধ্ব অন্ত্রে বা গ্রহণী নাড়ীতে প্রেরিত হয়। সেখানে পাচকরস যকৃতের পিত্তরস ও অগ্ন্যাশয়ের (Pancreas) পাচকপিত্তের সাহায্যে এই কার্য সম্পাদিত হয়। দেহযন্ত্রের ত্রুটির ফলে এখানেও খাদ্য যথাযথভাবে জীর্ণ না হতে পারলে পচে অত্যন্ত দূষিত হয়ে পড়ে ও তার সঙ্গে সঙ্গে অজীর্ণ পাচক পিত্তরসও দূষিত হয়ে দেহাভ্যন্তরে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। এই দূষিত পাচকপিত্তই পাকস্থলীর ক্ষত ও আন্ত্রিক ক্ষতের কারণ। আহারান্তে বিশ্রাম না নিয়ে মস্তিষ্কের বা শারীরিক পরিশ্রমে রত হৰার ফলে পাকস্থলীতে ও গ্রহণী নাড়ীতে রক্ত সঞ্চালন কমে যাওয়ায় আন্ত্রিক ঝিল্লী সহজেই অম্লবিষে আক্রান্ত হয়ে পড়ে ও ক্ষত সৃষ্টি হয়।

আমিষ জাতীয় খাদ্যবস্তুকে জীর্ণ করবার জন্যে অম্লরসস্রাবী গ্রন্থিগুলি যদি সক্রিয় থাকে অথচ কোষ্ঠৰদ্ধতা, অজীর্ণ বা অন্য কোন প্রকার ব্যাধির ফলে ক্ষাররসস্রাবী গ্রন্থি দুর্বল হয়ে পড়ে সেক্ষেত্রে দেহাভ্যন্তরে নিঃসৃত ক্ষাররস অম্লরসের সঙ্গে সমতা রক্ষা করে চলতে

পারে না ও উগ্র শক্তিশালী তথা বিষাক্ত অম্লরস অপ্রতিহত ভাবে নিজের কাজ করে যেতে থাকে। এই উদ্বৃত্ত অম্লরস দেহের যেখানে সঞ্চিত হবার সুযোগ পায় সেখানেই ধীরে ধীরে ক্ষত উৎপন্ন করে। পাকস্থলীতে, গ্রহণী নাড়ীতে বা যেখানে ঝিল্লী বা আবরণীকে এরা আক্রমণ করে আহত করে দেয়, সেখানে তৈরী হয় ক্ষত ও এই ভাবেই পাকস্থলীর ক্ষত, অন্ত্রের ক্ষত ও দেহাভ্যন্তরে আরও নানান রকমের ক্ষত হতে পারে।

অতিরিক্ত মানসিক পরিশ্রমে ও তৎসহ শারীরিক শ্রমের অভাবে, অতিরিক্ত বিষযুক্ত ঔষধ সেবনে (রক্তের রোগৰীজাণুকে ধ্বংস করবার জন্যে সাধারণতঃ এই সকল বিষ ঔষধ রূপে স্থূল মাত্রায় ব্যবহার করা হয়ে থাকে) অথবা রোগে বা রোগের সম্ভাবনায় বিষযুক্ত ঔষধ সূচিকাপ্রয়োগে গ্রহণ করলে অথবা অতিরিক্ত অসংযমের ফলে রক্ত নিঃসার হয়ে গেলে সেই দুর্বল রক্ত আন্ত্রিক ঝিল্লীসমূহকে দুর্বল করে দেয়, আর তাই তারা সেই দুর্বলাবস্থায় সঞ্চিত অম্লরসের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাতে অক্ষম হয় ও নিজেরা ক্ষতযুক্ত হয়ে পড়ে। এই ক্ষত যদি পাকস্থলীতে হয় সেক্ষেত্রে

আহারের পরক্ষণেই রোগী যন্ত্রণা ৰোধ করে। কিন্তু ওই ক্ষত যদি অন্ত্রে হয় সেক্ষেত্রে আহারের বেশ কিছুক্ষণ পরে রোগী যন্ত্রণা অনুভব করে। এই শেষোক্ত যন্ত্রণার সূত্রপাত হয় নাভির কিছুটা ডান দিক ঘেঁষে। পাকস্থলীর ক্ষততে খাদ্যবস্তু দেহাভ্যন্তরে থাকবার সুযোগ কমই পেয়ে থাকে। তাই এই রোগে রোগীর শরীর অল্পকালের মধ্যেই জীর্ণশীর্ণ হয়ে যায়। আন্ত্রিক ক্ষতে কিন্তু রোগীর চেহারায় বাহ্যিক পরিবর্তন আসতে বেশ সময় লাগে।

যে কোন কারণেই হোক না কেন, শরীরাভ্যন্তরে ক্ষত উৎপন্ন হলে সেই ক্ষতনিঃসৃত রক্ত বহির্গমনের পথ খোঁজে ও এই পথ সে করে নেয় বমন অথবা মলদ্বার বা মূত্রদ্বারের মাধ্যমে। পাকস্থলীর ক্ষত বা আন্ত্রিক ক্ষতের রোগীর তাই রোগের বাড়াবাড়ি অবস্থায় বমনেচ্ছা থাকে।

সূচীপত্র

# পাকস্থলীর ক্ষত ও আন্ত্রিক ক্ষত

বমনের পরে রোগী কিছুটা সুস্থ বোধ করে। কখনও কখনও বমনের সঙ্গে ঈষৎ কালচে ধরণের রক্তও নির্গত হয় (এই লক্ষণ রক্তপিত্ত রোগেও আছে)। রোগের বাড়াবাড়ি অবস্থায় মল অবশ্যই কালো রঙের হয়ে থাকে। এমনকি, রোগের যখন বাড়াবাড়ি অবস্থা নেই তখনও মল ঈষৎ গুলে গুল্লে ধরণের হয়ে থাকে ও তার রঙও কিছুটা কালচে ধরণের হয়ে থাকে। এই রোগের আক্রমণ সাধারণতঃ প্রথম যৌবনেই হয়ে থাকে ও যৌবনের শেষে বা প্রৌঢ়ত্বে মানুষকে ধ্বংস করে দেয়।

চিকিৎসা:

প্রত্যুষে: উৎক্ষেপমুদ্রা, যোগাসন, দীর্ঘপ্রণাম, ভুজঙ্গাসন, অগ্নিসার, পদহস্তাসন, আগ্নেয়ীমুদ্রা বা আগ্নেয়ী প্রাণায়াম।

সন্ধ্যায়: সর্বাঙ্গাসন, মৎস্যমুদ্রা, নৌকাসন, পশ্চিমোত্তানাসন, কর্মাসন, অগ্নিসার ও উড্ডয়ন।

পথ্য: এই রোগের বাড়াবাড়ি অবস্থায় অধিক পরিমাণে জল ও অম্লমধুর ফলের রস ছাড়া অন্য কিছুই খাওয়া উচিত নয়। রক্ত বমন হলে সেদিন রোগীকে দুর্বার রস বা কুক্সিমা পাতার রস ছাড়া আর কোন কিছুই খেতে দেবে না। পরে কিছুটা সুস্থ হ'লে অল্প পাতলা দুধ সামান্য মধুর সঙ্গে পান করতে দেবে। মল যতদিন কালচে থাকে ততদিন রোগীকে বিভিন্ন ধরণের অম্ল-মধুর ফলের রস, পাকা টমেটোর ছাঁকা রস, মিষ্টি নেবুর রস অথবা আলু উত্তম রূপে সিদ্ধ করে ভাল ভাবে চটকে পাতলা দুধের সঙ্গে খেতে দেবে।

রোগের বাড়াবাড়ি অবস্থা কেটে যাবার পরে রোগীকে আলু, পটোল, ঝিঙে, ধুন্দুল প্রভৃতি লঘুপাক তরিতরকারীর ঝোল বা ষ্টু (stew), পুরাতন চালের ভাত প্রভৃতি খেতে দেবে। এই অবস্থায় ভাত বা তাজা রুটির সঙ্গে অল্প পরিমাণে খাঁটি ঘি (গরম) বা

মাখন খাওয়া বাঞ্ছনীয়। রোগের লেশমাত্র যতদিন অবশিষ্ট থাকে ততদিন পর্যন্ত রোগী

যেন কিছুতেই এক সঙ্গে অনেকটা খাদ্য গ্রহণ না করে, অর্থাৎ একটু একটু করে দিনে যেন অনেক বার খায়। এই রোগের আরোগ্য পথ্যের উপর সর্বাধিক নির্ভর করে। তাই রোগমুক্তির পরেও দু'বৎসর খাদ্যবিধি কঠোরভাবে মেনে চলা উচিত।

বিধি-নিষেধ: অম্লদোষ এই রোগের প্রধান কারণ। তাই যে সকল

খাদ্যে অম্লদোষ বাড়তে পারে সেগুলিকে সযত্নে পরিহার করা বাঞ্ছনীয়। এই ধরণের রোগীর পক্ষে তাই আমিষ খাদ্য ও সর্ববিধ নেশার জিনিস ত্যাগ করতে হবে। পাকস্থলীকে উত্তেজিত করে দিতে পারে এমন খাদ্যও বর্জন করতে হবে। সুতরাং অতিরিক্ত মিষ্টি, ঝাল বা নোনতা খাদ্য এই ধরণের রোগীর পক্ষে কুপথ্য। রোগী মোটামুটি বিচারে সুস্থাবস্থায় এসে গেলে ক্ষারধর্মী খাদ্য

গ্রহণের ফল ভালই হবে। তবে ছিড়াযুক্ত খাদ্য রোগ সেরে যাবার পরও ব্যবহার না করাই ভাল। মোটামুটিভাবে সুস্থ হয়ে যাবার পরে রোগীর খাদ্যতালিকায় পালং, বেতো, মটর বা নালতে শাক (পাটশাক) থাকলে তাতে করে কোষ্ঠ পরিষ্কারে ও রক্তবমন দূরীকরণে বিশেষ সাহায্য করে। ঘিয়ে ভাজা শুশুনি শাকও ওই রোগের উত্তম ঔষধ। এই রোগীর পক্ষে জল বা দুধের সঙ্গে দিনে সবশুদ্ধ দু'তিন চামচ মধু খাওয়া দরকার। আহারান্তে কিছুটা বিশ্রাম না নিয়েই শারীরিক বা মানসিক পরিশ্রমে রত হওয়া অত্যন্ত ক্ষতিকর।

সূচীপত্র

# পিত্তাশ্মরী (Gallbladder stone)

লক্ষণ: সংস্কৃতে 'অশ্মরী' শব্দের অর্থ পাথর, তাই চলতি ভাষায় এই রোগকে বলা হয় পিত্ত-পাথুরী। পিত্তকোষে এই পাথর সৃষ্টি

হওয়ার ফলে আহারের সঙ্গে সঙ্গে নাভির দক্ষিণ পার্শ্বে বেদনা, বমনোদ্রেক ও বমনের পরে কিছুটা সুস্থতাবোধ এই রোগের লক্ষণ। রোগ কিছুটা পুরাতন হয়ে গেলে রোগীর অক্ষুধা ও শারীরিক দুর্বলতাও প্রৰলভাবে দেখা দেয়।

কারণ: যকৃৎ যন্ত্রটি একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থি। পিত্তরস নিঃসারণ, রস থেকে রক্ত সৃষ্টি ও রক্ত বিশুদ্ধীকরণ কার্যে এই যন্ত্রটিকে রত থাকতে হয়। যকৃৎ-নিঃসৃত পিত্তরস প্রথমে পিত্তস্থলীতে সঞ্চিত হয়, পরে সেখান থেকে পাকস্থলীতে ও ঊর্ধ্ব অন্ত্রে প্রেরিত হয়। রস-রক্তের দূষিত বস্তুসমূহকেও যকৃৎ ওই পিত্তের সঙ্গে পাকস্থলীতে প্রেরণ করে ও পরে সেখান থেকে সেগুলি অন্ত্রের সাহায্যে মলনাড়ীতে পৌঁছায় ও দেহ থেকে নিঃসারিত হয়ে যায়। রস-রক্তে দূষিত বস্তুর পরিমাণ বেশী থাকলে, বিশেষ করে অম্লবিষ অত্যধিক মাত্রায় থাকলে পিত্তরসের সঙ্গে ওই বস্তু খুৰ বেশী পরিমাণে পিত্তস্থলীতে প্রেরিত হয়। পিত্তস্থলীতে ওই রস থিতিয়ে গিয়ে দূষিত বস্তুসমূহ সার রূপে জমা হতে থাকে ও ক্রমশঃ তারা দানা বাঁধতে থাকে (crystalization)। এই ভাবে

পিত্তস্থলীতে ছোট-বড় নানা আকারের পাথর তৈরী হতে থাকে। আহারের পর পিত্তস্থলীর ওই পাথরগুলি পিত্তরসের পথ যখনই অবরোধ করতে চায়, তখনই দেহযন্ত্র বিশেষ শক্তি প্রয়োগ করে পিত্তস্থলী থেকে ওই পাথরগুলিকে  গ্রহণীনাড়ীতে ঠেলে বের করে দিতে চায়।

দেহযন্ত্রের এই বিশেষ শক্তি প্রয়োগই যন্ত্রণার সৃষ্টি করে। রোগের প্রথম অবস্থায় দেহযন্ত্র পাথরগুলিকে এই ভাবে ঠেলে বের করে দিতে পারে, কিন্তু রোগ পুরাণো হয়ে গেলে দেহযন্ত্র দুর্বল হয়ে পড়ায় অথবা পাথরের আকার বেশী বড় হয়ে পড়ায় তখন আর সেগুলিকে ঠেলে বের করে দেওয়া সম্ভবপর হয় না। রোগের এই পুরাতন অবস্থা সত্যই রোগীর পক্ষে প্রাণঘাতক হয়ে দাঁড়ায়।

চিকিৎসা:

প্রত্যূষে: উৎক্ষেপমুদ্রা, যোগমুদ্রা, দীর্ঘপ্রণাম, পদহস্তাসন ও নাসাপান, আগ্নেয়ীমুদ্রা বা আগ্নেয়ী প্রাণায়াম।

সন্ধ্যায়: অগ্নিসার, কর্মাসন, সর্বাঙ্গাসন।

পথ্য: মাদক দ্রব্য ও আমিষ খাদ্য, ঘি ও কোষ্ঠবদ্ধতাকারক খাদ্য কঠোরভাবে পরিত্যজ্য। রোগীকে প্রচুর পরিমাণে (আন্দাজ ৪/৫ সের) জল পান করতে হৰে ও একাদশী, অমাবস্যা ও পূর্ণিমায় নেৰুর রস সহ স-অম্বু উপবাস করতে হবে। রোগ যখনই একটু ৰেড়ে যাৰে তখনই অন্যান্য খাদ্য বন্ধ রেখে কেবল নেবুর জল খেয়েই থাকতে হবে। নিরম্বু উপবাস এ ব্যাধিতে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ।

বিধি-নিষেধ: রোগীর যকৃৎ যত বেশী বিশ্রাম পায় ততই মঙ্গল। তাই ফলের রস ও ক্ষারধর্মী খাদ্যই এই রোগে প্রশস্ত। রোগীকে অবশ্যই যথেষ্ট পরিমাণে শারীরিক পরিশ্রম করতে হবে কারণ এটি ধনীদেরই রোগ। বিশেষ করে ধনী গৃহের মহিলাদের মধ্যে এর প্রাদুর্ভাব বেশী। নেৰু এই রোগে ঔষধ ও পথ্য দুই-ই।

কয়েকটি ব্যবস্থা:

১) গোদুগ্ধে হরীতকীর অস্থি (আঁটি) সিদ্ধ করে (অস্থি ফেলে দিয়ে) ওই দুগ্ধ পান করলে,

অথবা

২) হরীতকী, মুথা, লোধ ও বটফল সমান ভাবে একত্রে দু'তোলা পরিমাণ নিয়ে তার ক্বাথ নিয়মিতভাবে পান করলে এই রোগে উত্তম ফল পাওয়া যায়। শেষোক্ত ঔষধটি বহুমূত্র রোগেও সেব্য।

ঔষধগুলি প্রত্যুষে খালি পেটে সেবনীয়।

সূচীপত্র

# পুরাতন গ্রন্থিস্ফীতি

লক্ষণ: বিভিন্ন গ্রন্থি ও তন্নিকটবর্তী অংশ ফুলে ওঠা, ওই স্ফীতির সঙ্গে চড়চড়ে ব্যথা (ব্যথা যে সর্ব ক্ষেত্রেই থাকবে তার কোন মানে নেই ও বেশী পুরাতন ব্যাধিতে ব্যথা না থাকাই স্বাভাবিক), মধ্যে মধ্যে জ্বর হওয়া ও জ্বর কালে গ্রন্থির স্ফীতি বেড়ে যাওয়া এই রোগের লক্ষণ।

কারণ:

১) পুরাতন জ্বরে ভুগে যকৃৎ ও প্লীহা দুর্বল হয়ে গেলে শরীরের রস-রক্তাদির রোগ-প্রতিরোধশক্তি কমে যায়। তখন গ্রন্থিগুলিও তাদের কাছ থেকে উপযুক্ত সাহায্য পায় না। এর ফলে যে গ্রন্থি বা যে গ্রন্থিগুলি সব চেয়ে বেশী অনাদৃত হয়ে পড়ে, তার বা তাদের নিজেদের কর্মধারা অব্যাহত রাখার জন্যে অতিরিক্ত পরিশ্রমে রত হতে হয়। এই অতিক্রিয়তার ফলে তারা বর্দ্ধিত বা স্ফীত হয়ে যায়।

২) খাদ্যে অরুণকের (আইয়োডিনের) অভাব ঘটলে যে সমস্ত গ্রন্থির সুস্থতার পক্ষে আইয়োডিন অত্যাবশ্যক তারা দুর্বল হয়ে পড়ে। এরূপ অবস্থাতেও তাদের মধ্যে স্ফীতি দেখা দেয়।

৩) শরীরের সার ধাতু শুক্রের অপচয় ঘটলে শরীরের প্রতিটি গ্রন্থিই দুর্বল হয়ে যায়, কারণ গ্রন্থিগুলি শুক্রের সাহায্যেই নিজেদের সুস্থতা রক্ষা করে থাকে। যে সকল গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থির পক্ষে শুক্র তথা আইয়োডিনের প্রয়োজন সমধিক, এর ফলে তাদের ক্ষতিই হয় সব চেয়ে বেশী। মানুষের কন্ঠস্থ থাইরয়েড গ্রন্থি এই ধরণের গ্রন্থি। তাই উপর্যুক্ত কারণগুলির মধ্যে যে কোন কারণে এই থাইরয়েড গ্রন্থি সহজে

আক্রান্ত হয়ে পড়ে। এই গ্রন্থিটির প্রধান পরিপোষক 'মন্যা' নামক নাড়ী দুইটি নিজেদের স্বাভাবিক কাজ করতে অপারগ হয়ে যায় ও স্ফীত হয়ে যায়। পরিণাম স্বরূপ, ক্রমশঃ সমগ্র গণ্ডদেশ স্ফীত হয়ে যায়। রোগটিকে বলা হয় গলগণ্ড। এই ধরণের গ্রন্থিস্ফীতি কর্ণমূলে, বাহুমূলে বা উরুসন্ধিতেও হতে পারে।

চিকিৎসা:

প্রত্যুষে: উৎক্ষেপমুদ্রা, কর্মাসন, উড্ডয়ন, ময়ূরাসন, ৰন্ধত্রয় ও সংশ্লিষ্ট গ্রন্থিনিয়ামক বিন্দুতে প্রাণায়াম।

সন্ধ্যায়: সর্ব্বাঙ্গাসন, মৎস্যমুদ্রা, অগ্নিসার, মৎস্যেন্দ্রাসন। রোগী আতপস্নান, জলপান বিধি, উপবাসবিধি যথাযথভাবে মেনে চলবে

পথ্য: দুধ, ফল প্রভৃতি আইয়োডিনযুক্ত খাদ্য এই রোগে প্রচুর পরিমাণে গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। কলা, পেঁপে, আনারস, কমলা, জাম ও টমেটো রোগীর পক্ষে অত্যন্ত সুপথ্য। রোগীকে কোষ্ঠ পরিষ্কারের দিকে অত্যন্ত নজর রাখতে হবে।

**বিধিনিষেধ** : এই জাতীয় গ্রন্থিস্ফীতি-রোগ সমুদ্র উপকূলবর্তী

অঞ্চল অপেক্ষা দেশের অভ্যন্তর ভাগে অধিক দৃষ্ট হয়। তাই সম্ভবক্ষেত্রে রোগী যদি কোন সমুদ্র তীরবর্তী স্থানে বায়ু পরিবর্তনের জন্যে যান তবে তাতে ভাল ফলই দেবে কারণ সমুদ্রের জলে যথেষ্ট পরিমাণ আইয়োডিন আছে। সেই জন্যে সমুদ্রতটবর্তী স্থানসমূহের বায়ুতে আইয়োডিন পাওয়া যায়। অতিরিক্ত শুক্রক্ষয়ের ফলেও পুরুষদের থাইরয়েড গ্রন্থি ফুলে উঠতে পারে। তাই শুক্রধাতু রক্ষায় যত্নবান হওয়া উচিত। নারীদের বহু প্রসবের ফলে, ঋতুরোগে, বিশেষ করে অতিস্রাবে অথবা সন্তানকে অতিরিক্ত পরিমাণ দুগ্ধ দান করার ফলেও থাইরয়েড গ্রন্থি স্ফীত হয়ে উঠতে পারে। স্ফীতি যদি অল্প কিছুদিনের জন্যে হয় তাতে ভয় পাবার বিশেষ কিছু থাকে না কারণ যথাসময়ে সতর্কতা অবলম্বন করলে এই রোগ দুরারোগ্য হতে পারে না। কিন্তু রোগ পুরাতন হয়ে গেলে রোগমুক্তির জন্যে উল্লিখিত বিধিনিষেধ দীর্ঘকাল ধরে নিষ্ঠার সঙ্গে প্রতিপালন করে চলতে হবে।

সূচীপত্র

# প্রমেহ (গণোরিয়া)

রোগটির পুরাতন কোন সংস্কৃত নাম নেই। মেহরাগের সঙ্গে অনেকটা সাদৃশ্য থাকায় এ রোগটিকে 'প্রমেহ' বলা হয়েছে। তবে 'গণোরিয়া' শব্দটিরই ব্যবহার বেশী।

লক্ষণ : পেশাবে জ্বালা, লিঙ্গমুণ্ড ফুলে ওঠা ও রক্তবর্ণ ধারণ করা, বিন্দু বিন্দু করে পেশাব করা অথবা শ্বেত হরিদ্রা বর্ণের স্রাব, রোগের প্রথম অবস্থায় শ্বেতবর্ণের ও পুরাতন অবস্থায় হরিদ্রাবর্ণের শুক্রত্যাগ, লিঙ্গমুণ্ডের চতুষ্পার্শে অথবা ছিদ্রপথে ক্ষত, জননেন্দ্রিয় শক্ত হয়ে ওঠা প্রভৃতি এই ব্যাধির লক্ষণ।

কারণ: গণোকোক্কাস নামক ৰীজাণু দ্বারা এই রোগের প্রসার হয়ে

থাকে। এটাই চিকিৎসকদের মত। এই রোগ অপরিচ্ছন্ন তথা অসংযমী

স্ত্রী-পুরুষের দেহে সৃষ্ট হয়। ওই সকল নারী বা পুরুষ অন্যান্য যাদের

দৈহিক সংস্পর্শে আসে তাদের দেহেও এই রোগ ছড়িয়ে পড়ে। পতিতা

নারীদের দেহ থেকে পুরুষদের দেহে সংক্রমিত হয়ে সেই সকল পুরুষের

দেহ থেকে নির্দোষ নারীদের দেহেও এই রোগ ছড়িয়ে পড়ে। সাধারণতঃ

এই রোগ স্পষ্টভাবে ফুটে ওঠার পূর্বে লিঙ্গনালীতে বা যোনির

অভ্যন্তরে শুড়শুড়ি বোধ বা চুলকানি ভাব জাগে ও চুলকানির পরে বা

জননযন্ত্র কোন প্রকারে ঘুরিয়ে বা ঘষে নেবার পরে রোগী কিছুটা জ্বালা

ও তৎসহ একটু সাময়িক স্বস্তি লাভ করে।

**চিকিৎসা:** উপদংশ ব্যাধির অনুরূপ।

পথ্য: কোষ্ঠ পরিষ্কার থাকে এইরূপ সমস্ত পুষ্টিকর খাদ্যই এই রোগী ব্যবহার করতে পারে। জল ও নেবুর রস প্রচুর পরিমাণে ব্যবহার করা উচিত। রোগীর উপবাসবিধিও যথাযথ ভাবে মেনে চলা দরকার। অতিভোজন, মাদক দ্রব্য ও আমিষ খাদ্য থেকে সযত্নে দূরে থাকতে হবে। উচ্ছে, পলতা, নিম ও শোজনে ফুল, ডাঁটা ও পাতা রোগীর পক্ষে সুপথ্য।

**বিধি-নিষেধ**: রোগটি যতটা না প্রাণঘাতক, তার চেয়েও বেশী ক্ষতিকারক কারণ এই রোগ ধীরে ধীরে গোটা সমাজ জীবনকেই দূষিত করে দেয়। রোগটি সহজে সারতে চায়না বা কখনও দীর্ঘদিনের জন্যে চাপা থাকে। আবার অল্প পরিমাণ অসংযমের ফলেই ফুটে ওঠে। তাই রোগীর পক্ষে দীর্ঘকাল ধরে নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য মেনে চলা দরকার। অন্যথায় তার সন্তান-সন্ততিগণকে অন্ধ বা বিকলাঙ্গ হয়ে জন্মগ্রহণ করতে হবে। সম্পূর্ণ রোগমুক্তির পরও অন্ততঃ তিন বৎসর কাল বিবাহ বা স্ত্রী-সংসর্গ কঠোরভাবে বর্জন করতে হবে। এই রোগের পূঁজ চোখে লাগার দু'/তিন দিনের মধ্যে অন্ধ হয়ে যেতে পারে। তাই এই পুঁজ হাতে লাগলে সঙ্গে সঙ্গে তা সাবান দিয়ে ধূয়ে ফেলা উচিত। স্নানান্তে অবশ্যই রোগগ্রস্ত স্থানটিতে রোদ লাগানো দরকার। যন্ত্রণা অসহ্য বোধ হলে জননযন্ত্র অল্প ফিটকিরি মিশ্রিত গরম জলে (যেমন সহ্য হয়) ডুবিয়ে রাখা উচিত। লিঙ্গের ছিদ্রপথটুকু বাদ দিয়ে অবশিষ্টাংশে হলদে রঙের মাটির প্রলেপ দিলেও যন্ত্রণার উপশম হয়। এই মাটি শুকিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে তা' ফেলে দিয়ে পুনর্বার নতুন মাটি ব্যবহার করা যেতে পারে। প্রমেহ রোগে রোগী জননযন্ত্রে অসহ্য

জ্বালা-যন্ত্রণা অনুভব করে, অনেক সময় পেশাৰ বন্ধ থাকে বা রক্ত পেশাৰ হয়। পেশাব সহজ সরল রাখবার জন্যে নিম্নলিখিত যে কোন একটি ব্যবস্থা অবলম্বন করা যেতে পারে:

১) প্রাতে এক পোয়া কাঁচা দুধ দেড় পোয়া ঠাণ্ডা জলের সঙ্গে একত্রে পান করলে,

অথবা

২) এক তোলা হেলেঞ্চার রস পান করলে,

অথবা

৩) এক তোলা কাঁচা হলুদ মিছরীর সরবতের সঙ্গে পান করলে,

অথবা

সূচীপত্র

৪) এক তোলা দেশী আমড়ার ছালের রস চীনীর সঙ্গে পান

করলে,

অথবা

৫) শুকনো যজ্ঞডুমুরের বীজচূর্ণ দু'/আনা পরিমাণ জল সহ সেবন করলে,

অথবা,

৬) এক তোলা অড়হর পাতার রস চীনীর সঙ্গে পান করলে পেশাবের ক্লেশ থেকে অব্যাহতি পাওয়া যায়।

৭) রাত্রে বাবলার আটা জলে ভিজিয়ে রেখে ভোরে চীনীর সরবতের সঙ্গে পান করলে অথবা কাবাৰ চীনীর গুঁড়ো এক আনা মিছরীর সঙ্গে পান করলে,

অথবা

৮) দশ ফোঁটা চন্দনতেল জলে ফেলে সেবন করলে, অথবা,

৯) আধ তোলা শ্বেতচন্দনচূর্ণ মিছরীর সরবতের সঙ্গে মিশিয়ে পান করলে,

অথবা

১০) এক আনা ইসবগুল মিছরীর সরবতের সঙ্গে সেবন করলে

অথবা

১১) বটের কোমল ঝুরি কাঁচা দুধে বেটে পান করলে প্রমেহ রোগীর পেশাবের ক্লেশ দূরীভূত হয়।

কয়েকটি ব্যবস্থা:

১) আধ পোয়া দুধের সঙ্গে দু'তোলা শতমূলীর রস সেবন করলে অথবা

২) চীনী ও দু'টি পলাশ ফুল একত্রে বেটে শীতল জলের সঙ্গে পান করলে,

অথবা

৩) কাঁচা হলুদের গুঁড়ো, আমলকীচূর্ণ এক আনা, শীতল জলের সঙ্গে সেবন করলে মেহ রোগ দূরীভূত হয়।

৪) একটি ডাবের মধ্যে এক আনা পরিমাণ ফিটকিরির গুঁড়ো ভরে ডাৰটি পাঁকের মধ্যে পুঁতে রেখে পরদিন সকালে তার জল পান করলে ভাল ফল পাওয়া যায়।

৫) এক ছটাক জলে লাল জবা ফুলের ৮/১০টি পাপড়ি ভালভাবে কচলে নিয়ে জলের রঙ লালচে হয়ে গেলে পাতা বাদ দিয়ে জল চীনী সহ সেবন করলে রোগ প্রশমিত হয়।

৬) গুলঞ্চের কাথ মধু সহ পান করলেও সর্ববিধ মেহ রোগ দূরীভূত হয়।

৭) রোগী তলপেটে অত্যধিক যন্ত্রণা অনুভব করলে নাভিতে শ্বেতচন্দন ঘষে প্রলেপ দিলে অল্প ক্ষণের মধ্যে ক্লেশ হয়।

৮) গণোরিয়ার রস বা পুঁজ লেগে চোখ লাল হলে বা চোখে পিচুটি পড়লে অপামার্গের কাজল ব্যবহার করলে অন্ধত্বের সম্ভাবনা দূরীভূত হয়। অপামার্গের একটি শুকনো ডাল প্রদীপের শীষে

পুড়িয়ে ওই ভস্ম গব্য ঘৃতে মেড়ে নিয়ে পায়রার পালকের সাহায্যে ওই কাজল চোখে ব্যবহার করতে হবে।

# বহুমূত্র

**লক্ষণ:** ঘন ঘন মূত্রত্যাগের ইচ্ছা, মূত্রনালীতে জ্বালা, ঘন ঘন পিপাসা ও মুখে মিষ্টি স্বাদ, পেশাবে মাছি বা পিঁপড়ে বসা, মাথা ধরা, চর্ম শুষ্ক ও ফ্যাকাসে হয়ে যাওয়া, অল্প বয়সে চেহারা বৃদ্ধের মত হয়ে যাওয়া, সর্বাঙ্গে জ্বালাপোড়া প্রভৃতি লক্ষণের সমাবেশই এই রোগের লক্ষণ। প্রায়ই দেখা যায় এই রোগে চোখে ছানি পড়ে।

কারণ: বহুমূত্র রোগে মূত্রে যে শর্করা থাকতেই হবে এমন কোন

কথা নেই। শর্করাযুক্ত বহুমূত্র রোগকে 'সোমরোগ' বা 'মধুমেহ' বলা হয়। শর্করাবিহীন বহুমূত্রকে 'মূত্রাতিসার' বা

'উদকমেহ' বলা হয়। মণিপুর চক্রের দুর্বলতাই এই রোগের কারণ। অগ্ন্যাশয়-নিঃসৃত রসসমূহের একটি ধারা খাদ্যবস্তুকে জীর্ণ করতে সাহায্য করে, অপর একটি ধারা আমিষ ও শ্বেতসার জাতীয় খাদ্যসমূহ থেকে শর্করা অংশকে পৃথক করে। ওই শর্করা যকৃতের অংশবিশেষে সঞ্চিত থাকে ও প্রয়োজন মত দগ্ধ হয়ে শরীরকে উত্তাপ ও জীবনীশক্তি সরবরাহ করে থাকে। দীর্ঘ দিনের অজীর্ণ, কোষ্ঠবদ্ধতা (সাধারণতঃ এতেও মল গুটলে গুটলে হয়ে থাকে), মানসিক শ্রম ও শারীরিক শ্রমের অভাব, মাদক দ্রব্যের ব্যবহার বা অতিমাত্রায় শুক্রক্ষয়ের ফলে যকৃৎ দুর্বল হয়ে পড়লে ওই শর্করা যকৃতে স্থান লাভ করতে পারে না ও তা' ক্রমশঃ রক্তে গিয়ে জমতে থাকে আর তার ফলে রক্ত দূষিত হয়ে পড়ায় রোগ- প্রতিরোধ ক্ষমতাও অসম্ভব কমে যায়। প্রাকৃতিক ব্যবস্থা সেই সময় রক্তকে পরিষ্কার করার জন্যে রক্ত থেকে শর্করা অংশকে পৃথক করে দিতে চায় ও ওই শর্করা মূত্রের সঙ্গে দেহ থেকে নিঃসারিত হতে থাকে।

শর্করাকে তরল অবস্থায় রাখবার জন্যে দেহে জলের প্রয়োজন হয়ে থাকে। তাই রোগী ঘন ঘন পিপাসা বোধ করে। মূত্রের সঙ্গে ব্যাপকভাৰে শর্করা বহির্গত হয়ে যাওয়ায় রোগীর জীবনীশক্তি ক্রমশঃ কমে আসে।

চিকিৎসা:

প্রত্যুষে:

উৎক্ষেপমুদ্রা, কর্মাসন, অগ্নিসার, উপবিষ্ট উড্ডয়ন, জানুশিরাসন, আগ্নেয়ী মুদ্রা বা আগ্নেয়ী প্রাণায়াম।

সন্ধ্যায়:

যোগমুদ্রা, দীর্ঘপ্রণাম, ভুজঙ্গাসন, পশ্চিমোত্তানাসন, ভস্ত্রিকাসন ও অগ্নিসার।

পথ্য: বহুমূত্র রোগটি মূলতঃ অগ্ন্যাশয় ও যকৃতেরই ব্যাধি। তাই এতে অগ্ন্যাশয় ও যকৃতের সুস্থতার দিকে দৃষ্টি দিতে হবে ও কোষ্ঠ পরিষ্কার রাখে অথচ পুষ্টিকর ও সহজে জীর্ণ হয় এইরূপ খাদ্যই রোগীকে গ্রহণ করতে হবে। সব রকমের ফলই এই রোগে সুপথ্য, বিশেষ করে পাকা কলা অত্যন্ত উপকারী। রোগীর পক্ষে আমিষ খাদ্য অবশ্যই পরিত্যজ্য। নিরামিষ প্রোটিনও অম্লধর্মী, তাই তার পরিমাণও যত দূর সম্ভব কমিয়ে ফেলা দরকার। সেজন্যে ভাত বা রুটি কম করে খেয়ে তরিতরকারীর ঝোল, কাঁচা কলার ঝোল, পটোল, ঢেঁড়স, ধুন্দুল, পলতা, লাউ, থোড়, মোচা, ডুমুর প্রভৃতি ক্ষারধর্মী খাদ্য অধিক পরিমাণে ব্যবহার করা উচিত। 1

বিধি-নিষেধ: বহুমূত্র রোগটি বুদ্ধিজীবীদের রোগ। যারা শারীরিক পরিশ্রম করে এ রোগ তাদের ক্বচিৎ দেখা যায়। মস্তিষ্কের পরিশ্রমের সঙ্গে সঙ্গে অধিক পরিমাণে ঘরের মধ্যে থাকা, শারীরিক অলসতা, কোষ্ঠবদ্ধতা, অসংযম প্রভৃতি বিভিন্ন কারণই রোগটিকে উৎপন্ন করে। আগেই বলা হয়েছে, রোগটি মূলতঃ অগ্ন্যাশয় ও যকৃতের। তাই যে সকল খাদ্য ওই সকল

গ্রন্থিকে বেশী উত্তেজিত বা অতিক্রিয় করে না, সেই সকল খাদ্যই গ্রহণ করা উচিত আর যে সকল কার্য ওই

গ্রন্থিগুলিকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে সাহায্য করে সেই সকল কার্যই অধিক পরিমাণে করা উচিত। যে শারীরিক শ্রমে বিমুখ তার বহুমূত্র রোগ সারা সম্ভব নয়। শরীরে আমিষ জাতীয় বা শ্বেতসার জাতীয় খাদ্যের প্রয়োজনও রয়েছে। তাই তাদের মধ্যে যেগুলি অম্লধর্মী নয়- ক্ষারধর্মী, সেগুলির পরিমাণ বাড়িয়ে দিয়ে রোগীর উচিত তার আমিষ ও শ্বেতসারের প্রয়োজন মিটিয়ে নেওয়া। এইজন্যে নারকোল, চীনে বাদাম (বিনা চীনীতে অল্প মধুসহ বা বিনা মধুতে বাদামের সরবত এই রোগে আহার-ঔষধ দুই-ই), দই, কলা প্রভৃতি অধিক পরিমাণে ব্যবহার করা উচিত। মনে রাখা উচিত 'ইনসুলিন' (Insulin) প্রয়োগে এই রোগে রোগীর জীবনীশক্তি বাড়িয়ে দেওয়া সম্ভবপর হলেও রোগারোগ্য সম্ভব নয়। সাধারণতঃ এই রোগী একটু লোভী হয়ে থাকে। তাই কখনও কখনও অত্যধিক শর্করা জাতীয় খাদ্য গ্রহণ করার ফলে এই

রোগ ফুটে ওঠে। রোগীকে লোভ সংবরণ করতে হবে ও উপবাস অভ্যাস করতে হবে।

রোগের বাড়াবাড়ি অবস্থায় নেৰুর রস বা সামান্য ফলের রস সহ স-অম্বু উপবাস এক টানা দু'/তিন ধরে দিলে পেশাবে শর্করার মাত্রা খুৰই কমে যায়। কখনও কখনও তাতে শর্করা পাওয়াই যায় না। এই প্রসঙ্গে আরও একটা কথা মনে রাখা দরকার যে মূত্রাশয় বা দেহাভ্যন্তরস্থ কোন কোন গ্রন্থিতে আঘাত লাগলেও সাময়িকভাবে মূত্রে শর্করা পাওয়া যায়। এই ধরণের ক্ষেত্রে ভুল ক্রমে 'ইনসুলিন' ব্যবহার করা হলে রোগীকে ক্ষতিগ্রস্তই করা হয়। এরূপ অবস্থায় দেহের যে অংশ আহত হয়েছে তার জন্যে উপযুক্ত চিকিৎসা করা হলে পেশাব আপনা থেকেই শর্করামুক্ত হয়ে যায়।

**কয়েকটি ব্যবস্থা:**

১) হরীতকী, মুথা, লোধ ও ৰটফুল সমান ভাবে নিয়ে ফুটিয়ে তাদের ক্বাথ দু' তোলা পরিমাণ কিছু দিন প্রত্যুষে নিয়মিত পান করলে বহুমূত্র রোগে ফল পাওয়া যায়।

২) আধ পোয়া আন্দাজ পেয়ারা পাতা ভাল ভাবে থেঁতো করে পূর্ব দিন রাত্রে জলে ভিজিয়ে রেখে পর দিন সকালে সেই জল ছেঁকে নিয়ে পান করলে রোগের বাড়াবাড়ির সময় বিশেষ ফল পাওয়া যায়।

৩) ক) যজ্ঞডুমুরের রস এক তোলা মধু সহ,

অথবা

খ) তেলাকুচা পাতার রস এক তোলা মধু সহ প্রত্যুষে লেহন করে খেলে বহুমূত্র প্রশমিত হয়।

৪) ক) জাম আঁটির শাঁস এক আনা মধু সহ,

অথবা

খ) শুষ্ক শিমূল মূলচূর্ণ এক আনা মধু সহ লেহন করে খেলে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়।

৫) রোগ বৃদ্ধির সময় এক ছটাক বাঁশ পাতা আধ সের জলে ফুটিয়ে সেই জল আধ পোয়া থাকতে নামিয়ে ছেঁকে পান করলে সদ্য সদ্য সুফল পাওয়া যায়।

৬) গেঁটে দুর্বা, যজ্ঞডুমুর, আমলকী, হরীতকী, ধনে ও গন্ধমুথা সমানভাবে নিয়ে আধ সের জলে সিদ্ধ করে আধ পোয়া থাকতে নামিয়ে এক সপ্তাহ কাল প্রত্যুষে নিয়মিত রূপে পান করলে বেশ সুন্দর ফল পাওয়া যায়।

সূচীপত্র

# বধিরতা

লক্ষণ: এই রোগে আক্রান্ত হবার প্রথমের দিকে রোগী কাণে ভোঁ ভোঁ শব্দ শোণে ও ক্রমশঃ অন্যান্য সমস্ত শব্দই রোগীর কাছে অস্পষ্ট হয়ে যেতে থাকে।

কারণ: জন্মগত কারণ ব্যতিরেকে বধিরতা নিজে কোন রোগ নয়- অন্য রোগের প্রতিক্রিয়া মাত্র। তাই এ রোগের অজস্র কারণ থাকতে পারে।

১) অতিরিক্ত কুইনাইন বা অন্য কোন বিষ ঔষধ রূপে দীর্ঘ কাল ব্যবহার করলে শ্রবণশক্তি হ্রাসপ্রাপ্ত হয় বা স্তম্ভিত হয়ে যায়।

২) পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে প্রৌঢ়ত্বে বা বার্দ্ধক্যে অনেক লোকের শ্রবণযন্ত্রের স্নায়ুপুঞ্জ দুর্বল হয়ে পড়ে ও তার ফলে বধিরতা দেখা দেয়।

৩) অতিরিক্ত মাদক দ্রব্যের ব্যবহারের ফলে রক্তে অম্লদোষ বেড়ে গেলে শ্রবণশক্তি হ্রাসপ্রাপ্ত হয়।

৪) যাদের শ্লেষ্মাপ্রধান ধাত তাদের কখনও কখনও অতিরিক্ত শ্লেষ্মা জমে শ্রবণযন্ত্রের কাজকর্ম ব্যাহত হয় ও তার ফলে বধিরতা রোগ সৃষ্ট হয়।

৫) অতিরিক্ত শুক্রক্ষয়ের ফলে শ্রবণশক্তি শোচনীয়ভাবে কমে যায় ও তাতে করে স্থায়ী বধিরতা সৃষ্টি হয়ে থাকে।

৬) যাদের নস্য গ্রহণের অভ্যাস আছে অথবা যাদের জোরে নাক ঝাড়বার অভ্যাস আছে তাদেরও অনেক সময় শ্রবণস্নায়ুর স্বাভাবিক কর্মধারা ব্যাহত হয়ে যাওয়ায় বধিরতা দেখা দেয়।

৭) কূপিত বায়ু বা শ্লেষ্মা কর্ণের স্নায়ুতন্তুর স্বাভাবিক কাজে ৰাধা দিয়ে বধিরতার সৃষ্টি করে।

৮) কর্ণমূলের স্ফীতি বা কাণে পুঁজ সঞ্চয়ের ফলে বধিরতা দেখা দিতে পারে।

চিকিৎসা, পথ্য ও বিধি-নিষেধ:

যে ব্যাধির ফলে বধিরতা সৃষ্টি হয়েছে সেই ব্যাধিটির চিকিৎসা করলে ধীরে ধীরে এ রোগ সেরে যাবে।

সূচীপত্র

# বাত রোগ

লক্ষণ : পেশী বা বিভিন্ন সন্ধিস্থলে স্ফীতি ও আড়ষ্টভাব, ওই সকল স্ফীতিতে তীব্র যন্ত্রণা অথবা স্ফীত স্থান বেঁকে যাওয়া প্রভৃতি এই রোগের লক্ষণ।

কারণ: রোগটির কারণ হুবহু অম্লরোগের মত অর্থাৎ দেহে অম্লবিষের আধিক্য হেতু বায়ু কূপিত হয়ে এই রোগ সৃষ্ট হয়।

চিকিৎসা: অম্লরোগের অনুরূপ।

রোগীর পক্ষে যথেষ্ট জল পান (প্রত্যহ ৪/৫ সের, তবে এক সঙ্গে নয়) করা উচিত ও স্নানবিধি মেনে চলা উচিত। প্রথমে কয়েক বার রোগগ্রস্ত স্থানে ও তৎপরে সর্ব শরীরে আতপস্নান করে নেওয়া উচিত। আতপস্নানের যা বিধি অর্থাৎ গ্রীষ্মে ও শীতে নির্দিষ্ট সময়ে অঙ্গবিশেষে বা সর্বাঙ্গে একবারে একটানা ১৫/২০ মিনিট রোদ লাগিয়ে শরীর বা অঙ্গবিশেষ উষ্ণ হয়ে যাবার পর ছায়ায় এসে ভিজে গামছা বা তোয়ালে দ্বারা সেই স্থান মুছে ফেলতে হবে। এইরূপ একাধিক বার করা যেতে পারে।

পথ্য: শরীরে অম্লদোষের প্রাধান্যই এই রোগের কারণ। তাই রোগীর পক্ষে ক্ষারধর্মী খাদ্য যত গ্রহণ করা যায় ততই কল্যাণ।

খাদ্যের তিন চতুর্থাংশ যদি ক্ষারধর্মী হয় তবে অল্প মধ্যেই এই রোগ সম্পূর্ণ রূপে সেরে যেতে পারে অর্থাৎ রোগীর পক্ষে সব রকমের টক, মিষ্টি ফলমূলই সুপথ্য। একাদশী, পূর্ণিমা ও অমাবস্যায় নেবুর রস সহ স-অম্বু উপবাসবিধি অবশ্যই মেনে চলতে হবে। রাত্রে ভাতের পরিবর্তে অপেক্ষাকৃত শুকনো জিনিস, যেমন রুটি, ব্যবহার করাই প্রশস্ত। তবে ফলমূল ও তরিতরকারীর ঝোল প্রভৃতি ক্ষারধর্মী খাদ্যের তুলনায় ভাত, রুটি, লুচি প্রভৃতি শ্বেতসার তথা অম্লধর্মী খাদ্যের পরিমাণ যত কম হয় ততই ভাল।

বিধি-নিষেধ: অম্লরোগের অনুরূপ। রোগীর কোষ্ঠ পরিষ্কারের দিকে বিশেষ নজর রাখতে হবে।

কয়েকটি ব্যবস্থা: অম্লরোগের ব্যবস্থাগুলির প্রত্যেকটি এই রোগ সম্বন্ধেও প্রযোজ্য; অধিকন্তু,

১) রোগ লক্ষণ প্রকাশ হবার সঙ্গে সঙ্গে মৃদু বিরেচকের ব্যবস্থা নিলে অল্পায়াসেই রোগ সেরে যায়। সোঁদালের কচি পাতা ১০/১২টি ঘিয়ে ভেজে,

অথবা

২) বিছুটির কচি পাতা ১০/১২টি ঘিয়ে ভেজে ভাতের সঙ্গে খেলে রোগের প্রথম অবস্থায় সুন্দর ফল পাওয়া যায়।

৩) রেড়ির তেল কিঞ্চিৎ লবণ সহ,

অথবা

৪) আকন্দের আঠা কিঞ্চিৎ লবণ সহ রোগগ্রস্ত স্থানে মালিশ করলে ভাল ফল পাওয়া যায়।

৫) শোজনের আঠা একটু হিং সহ জলে গুলে গরম করে বাতের স্থানে বসিয়ে রাখলে,

অথবা

৬) রসোন, আদা ও অপামার্গের মূল একত্রে বেটে রোগগ্রস্ত স্থানের উপর বসিয়ে রাখলে বাতরোগ নিবৃত্ত হয়।

৭) শূকরমাংস সরষের তেলে ভেজে সেই তেল,

অথবা

৮) বাঘের চর্বি মালিশ করলে বাত রোগের ক্লেশ প্রশমিত হয়।

৯) অনন্তমূলের কাথ মধু সহ,

অথবা

১০) গুলঞ্চের ক্বাথ শীতল করে প্রত্যহ ভোরে পাঁচ তোলা পরিমাণ খেলে অল্প দিনের মধ্যে সুফল পাওয়া যায়।

১১) দুতোলা ত্রিফলা (তিনটিই সম পরিমাণ) আধ সের জলে সিদ্ধ করে আধ পোয়া থাকতে নামিয়ে উষ্ণ থাকতে থাকতে তাতে দু'তোলা পরিমাণ আদার রস মিশিয়ে তিন দিন পান করলে বাত জ্বর (শ্লীপদ বা ফাইলেরিয়া যা কিছু সংক্রান্ত হোক না কেন) অবশ্যই সেরে যায়।

সূচীপত্র

# মুষ্কশোথ (হাইড্রোসিল)

লক্ষণ : মুষ্ক ফুলে ওঠা, মুষ্কসংযোজক স্নায়ুরজ্জু তথা রক্তবাহী নাড়ী ফুলে শক্ত হয়ে ওঠা, তলপেটে ও অণ্ডকোষে টনটনে ব্যথা অনুভব করা, জল সঞ্চয়ের ফলে অণ্ডকোষে স্ফীতি প্রভৃতি এই ব্যাধির লক্ষণ।

কারণ: এই রোগের কারণ সাধারণতঃ দ্বিবিধঃ (ক) আভ্যন্তরীণ ও (খ) বাহ্যিক।

ক) শরীরের বিভিন্ন অংশে শুক্র সঞ্চয়ের জন্যে কয়েকটি গ্রন্থি আছে। এ গ্রন্থিগুলিতে শুক্র থেকে জীবনীরক্ষক কীটসমূহ উৎপন্ন হয়। পুরুষের মুষ্কদ্বয় এই জাতীয় শুক্রগ্রন্থি। মনে কাম চিন্তা অথবা কোন প্রকারের কামোত্তেজনা সৃষ্ট হবার সঙ্গে সঙ্গে এই গ্রন্থি সক্রিয় হয়ে ওঠে ও দ্রুত পুংৰীজ (spermatozoa) নির্মাণ করে ও শুক্র সহ এই পুংৰীজকে শুক্রস্থলীতে প্রেরণ করে। সুপ্তিস্খলনে বা মৈথুনকালে শুক্র সহ এই পুংৰীজ দেহ থেকে নির্গত হয়ে যায়। কোন কারণে ওই শুক্র যদি বহির্গমনের পথ না পায় অথবা শুক্রের বেগ যদি অবৈধভাবে বন্ধ করা হয়, সেক্ষেত্রে এই শুক্র শুক্রস্থলীতে থেকে বিকৃতিপ্রাপ্ত হয়। এই ধরণের অবস্থায় ব্যষ্টিবিশেষের যদি পিত্তদোষ, কোষ্ঠকাঠিন্য প্রভৃতি রোগে রক্ত ও তৎসহ দেহনিম্নাংশস্থিত গ্রন্থিগুলি দুর্বল হয়ে যায়, সেক্ষেত্রে ওই বিকৃতিপ্রাপ্ত শুক্র জলবৎ তরল হয়ে যায় ও তার ফলে মুষ্কশোথ

রোগ সৃষ্টি হয়। ধীরে ধীরে সমগ্র অণ্ডকোষটি স্ফীত হয় ও পরে ওই স্ফীতি স্থায়ী ভাব গ্রহণ করে।

(খ) কৌপীন না পরে অধিক লম্ফ-ঝম্প করার ফলে, মুষ্কে হঠাৎ কোন আঘাত লাগলে মুষ্ক তথা তার ধারক স্নায়ুরজ্জু বা ধমনী ফুলে উঠতে পারে। তার ফলে ওই অঞ্চলে জলসঞ্চার হয়ে মুষ্কশোথ রোগটি উৎপন্ন হতে পারে। যাঁরা অবগাহন স্নান করেন না তাঁরা যদি দণ্ডায়মান অবস্থায় স্নান করেন, সেক্ষেত্রেও তলপেট ও পিছন দিককার অংশ শুষ্কই থেকে যায় ও তাঁর ফলে দেহের ওই সকল অংশে স্নায়বিক আক্ষেপ দেখা দিতে পারে ও তার পরিমাণ স্বরূপ মুষ্কশোথ রোগ উৎপন্ন হতে পারে।

চিকিৎসা:

প্রত্যূষে: উৎক্ষেপমুদ্রা, বস্তিমুদ্রা, বস্তিকুম্ভক, আন্তসী মুদ্রা বা আন্তসী প্রাণায়াম, সর্বাঙ্গাসন ও গোমুখাসন।

সন্ধ্যায়: উপবিষ্ট উড্ডয়ন, অগ্নিসার, শয়নৰজ্রাসন। রোগী খালি পেটে যখনই সুযোগ পাবে বস্তিকুম্ভক করৰে। স্নানবিধি ও জলপানবিধিও যথারীতি চলৰে।

পথ্য: যকৃতের অবস্থা বুঝে সব রকমের পুষ্টিকর খাদ্যই গ্রহণ করা যেতে পারে। তৰে কোষ্ঠ পরিষ্কারের দিকে খুব বেশী নজর রাখতে হৰে। একাদশী, পূর্ণিমা ও অমাবস্যায় উপবাসবিধি মেনে চলতে হবে।

বিধি-নিষেধ: রোগের অন্যান্য কারণগুলির মধ্যে কামোত্তেজনা ও কামচিন্তা অন্যতম কারণ। তাই সেগুলি থেকে যত দূর সম্ভব দূরে থাকতে হবে। রোগীর পক্ষে কৌপীন ব্যবহার অবশ্যই বাঞ্ছনীয়। ঠাণ্ডা- গরম সেঁকও রোগীকে দ্রুত ফল দিয়ে থাকে।

সেঁকের পদ্ধতি: চিৎ হয়ে শুয়ে রোগগ্রস্ত স্থানের উপর বরফের অথবা খুব শীতল জলের সেঁক একটানা ১৫/২০ মিনিট ধরে দিতে

হৰে। স্থানটির চামড়া অত্যন্ত ঠাণ্ডা হয়ে গেলে পরে ২/১ মিনিট ওই স্থানে ঈষৎ গরম ফ্লানেলের সেঁক দিয়ে স্থানটির চামড়া আবার কিছুটা  গরম করে নিতে হবে। পুনরায় ১৫/২০ মিনিট ঠাণ্ডা সেঁক দিয়ে আবার অল্প সময়ের জন্যে গরম সেঁক দিতে হবে। রাত্রে শয়নের পূর্বেও এইভাবে কয়েকবার ঠাণ্ডা-গরম সেঁক দিতে হবে। শেষের বার ঠাণ্ডা সেঁকের পর আর গরম সেঁক দিতে নেই অর্থাৎ যখনই সেঁক ৰন্ধ করা হবে তখন যেন রোগগ্রস্ত স্থান ঠাণ্ডা থাকে।

কয়েকটি ব্যবস্থা:

১) অণ্ডকোষে কদম পাতা বেঁধে রাখলে,

অথবা

২) জলে নিশাদল গুলে তারই জলপট্টি বেঁধে রাখলে অথবা

৩) শ্বেতচন্দন ও আফিং একত্রে গুলে রোগগ্রস্ত স্থানে প্রলেপ দিলে,

অথবা

৪) আমপাতা, জামপাতা, বেলপাতা ও নেৰুপাতা একত্রে বেটে প্রলেপ দিলে এই রোগ প্রশমিত হয়।

৫) ব্রহ্মযষ্টির (বামুনহাটির) মূল চাল-ধোয়া জলে বেটে প্রলেপ দিলে,

অথবা

৬) মঙ্গলবারে আ-ফলা কুল গাছের শিকড় কোমরে বেঁধে কোষ পর্যন্ত ঝুলিয়ে রাখলে এই রোগ প্রশমিত হয়।

৭) বো◌েরাচক গাছের পাতার আঁশ কিছুটা নিয়ে কোমরে বেঁধে রাখলে এই রোগে অত্যল্পকালের মধ্যে ভাল ফল পাওয়া যায়।

সূচীপত্র

# মূত্রাশ্মরী

লক্ষণ : পেশাৰ ত্যাগে ক্লেশ হওয়া, বিন্দু বিন্দু পেশাৰ হওয়া, কখনও কখনও মূত্রস্তম্ভ বা রক্তমূত্র হওয়া এই ব্যাধির লক্ষণ

কারণ: মানুষের যকৃৎ-প্লীহার নীচে শরীরের দুই পাশে দুইটি

মূত্রগ্রন্থি (বৃক্ক বা কিডনি) আছে। যকৃৎ যন্ত্রটিকে বহুবিধ কাজে ব্যস্ত

থাকতে হয় বলে রক্ত সংশোধনের ষোল আনা কাজ তার পক্ষে করা

সম্ভব হয়ে ওঠে না। তাই তার অবশিষ্ট বা অসমাপ্ত কাজ মূত্রগ্রন্থি দুটিই

করে দেয়। মূত্রগ্রন্থি দেহের দূষিত বস্তুসমূহকে ও উদ্বৃত্ত জলকে ছেঁকে

বিশুদ্ধ রক্তকে দেহ-পরিপোষণের কাজে পাঠিয়ে দেয়। এই উদ্বৃত্ত জল

ও অপ্রয়োজনীয় বস্তুসমূহ মূত্রগ্রন্থির নিম্নস্থ গহ্বরে সঞ্চিত হয় ও সেখান

থেকে মূত্রাশয়ে প্রেরিত হয়। অবশেষে ওই উদ্বৃত্ত তরল বস্তু পেশাৰ

রূপে মূত্রনালীর মাধ্যমে দেহ থেকে নির্গত হয়ে যায়। রক্তে অম্লভাগের

আধিক্য থাকলে অথবা রক্ত অন্য কোন বিষে জর্জরিত হয়ে পড়লে

হৃদ্যন্ত্র, যকৃৎ, মূত্রগ্রন্থি (বৃক্ক) -এরা সকলেই দুর্বল হয়ে পড়ে। এমনকি

রক্ত-সঞ্চালন ব্যবস্থাও অব্যাহত রাখবার জন্যে হৃদ্যন্ত্র রক্তবহা নাড়ীর

উপর যথোপযুক্ত চাপ দিতেও ক্রমশঃ অক্ষম হয়ে পড়ে। এই রকম

অবস্থা কিছুদিন ধরে চলতে থাকলে স্বাভাবিক নিয়মে মূত্রগ্রন্থির গহ্বরে

ও মূত্রাশয়ে যে মূত্র সঞ্চিত হয় তাতে উদ্বৃত্ত জলের তুলনায় অন্যান্য

দূষিত বস্তুর পরিমাণ খুবই বেশী হয়ে পড়ে। এই মূত্র থিতিয়ে গেলে ওই

দূষিত বস্তুসমূহ দানা বাঁধতে থাকে। এই দানা বা পাথরগুলি ছোট-বড়

বিভিন্ন ধরণের হয়ে থাকে বা হতে পারে। মূত্র ত্যাগকালে এদের অবস্থিতি নিবন্ধন মূত্রপ্রবাহ রুদ্ধ হবার উপক্রম হয়। সে অবস্থায় দেহযন্ত্র এগুলিকে সরিয়ে নিয়ে মূত্রপ্রবাহকে সচল রাখবার চেষ্টা করে। দেহযন্ত্রের এই চেষ্টাই রোগীর কাছে যন্ত্রণা রূপে অনুভূত হয়। দূষিত বস্তুতে পরিপূর্ণ মূত্র যেখানে যেখানে থিতোবার সুযোগ পায় সেখানে সেখানেই এ সকল দূষিত বস্তু দানা বেঁধে মূত্রাশ্মরী রোগ সৃষ্টি করতে পারে।

চিকিৎসা, পথ্য ও বিধি-নিষেধ: পিত্তাস্মরীর অনুরূপ।

**কয়েকটি ব্যবস্থা:**

১) দু' তোলা মসিনা বা কুলোখ কলায় রাত্রে আধ পোয়া গরম জলে ভিজিয়ে পরদিন প্রাতে সেবন করলে,

অথবা

২) পাথরকুচি পাতার রস (দু' তোলা) জলের সঙ্গে পান করলে পেশাবের ক্লেশ দূরীভূত হয়। এই রোগেও রোগীকে খুব বেশী জল খেতে হবে, খুৰ বেশী নেৰু ব্যবহার করতে হবে ও নিরুম্ব উপবাস ৰন্ধ রাখতে হবে। নেবুর রস সহ স-অম্বু উপবাস যত বেশী করা যায় ততই ভাল। হরীতকীর অস্থি গরম দুধে ফুটিয়ে অস্থি ফেলে দিয়ে সেই দুধ পান করলে, অথবা হরীতকী, মুথা, লোধ ও বটফল একত্রে সম পরিমাণে দু' তোলা নিয়ে তার ক্বাথ পান করলেও এই রোগে আশু উপকার পাওয়া যায়।

সূচীপত্র

সূচীপত্র

# যক্ষ্মা

লক্ষণ: সকালে সন্ধ্যায় গলা ঘড় ঘড় করা, স্বরভঙ্গ, শুকনো কাশি অথবা শ্লেষ্মায় লাল রক্তের ছিট থাকা বা রক্ত বমন হওয়া, সন্ধ্যার দিক থেকে ঘুসঘুসে জ্বর হওয়া, বুকে পিঠে বেদনা, দুর্বলতা বোধ ও নৈশ ঘর্ম, বিশেষ করে মাথা ঘেমে যাওয়া- এইগুলি যক্ষ্মার প্রধান লক্ষণ।

কারণ: যক্ষ্মার বীজাণু প্রায় সকল মানব দেহেই কম-বেশী পরিমাণে

আছে। মানুষের রক্তের তেজ তথা জীবনীশক্তি যতক্ষণ বেশী স্বাভাবিক থাকে ততক্ষণ এই জীবাণু শরীরের কোন ক্ষতি করতে

পারে না বা রোগ সৃষ্টি করতে পারে না। কতকগুলি বিশেষ কারণে রক্তের তেজস্বিতা তথা বিশুদ্ধি নষ্ট হয়ে গেলে শরীবের বিভিন্ন গ্রন্থিতে বা সন্ধিতে এই রোগের বীজাণু বাসা বাঁধবার সুযোগ পায়।

রক্ত যার বিশুদ্ধ সাধারণতঃ ফুসফুসের সবলতা তার থাকেই। তাই সে অবস্থায় রোগবীজাণুর পক্ষে শরীরকে আক্রমণ করা সম্ভব হয় না। কিন্তু রক্তের দুর্বলতার ফলে ফুসফুস কিছুটা দুর্বল হয়ে পড়লে রোগবীজাণু সেখানে আশ্রয় নিতে আরম্ভ করে। এই অবস্থায় নিজেকে সুস্থ রাখবার জন্যে ফুসফুস রোগৰীজাণু সমূহকে ঝেড়ে ফেলে দিতে চায়। এই ঝেড়ে ফেলবার প্রয়াসই কাশি রূপে আত্মপ্রকাশ করে। দেহাভ্যন্তরকে কফমুক্ত রাখবার জন্যে প্রাকৃতিক নিয়মে যে কাশির উদ্রেক হয় তা' মোটেই ক্ষতিকর নয় ও এইরূপ নির্দোষ কাশিকে চেনার উপায় হচ্ছে এই যে এই ধরণের কাশির সঙ্গে কম বেশী শ্লেষ্মা মিশ্রিত থাকে কিন্তু যেখানে কাশি শুল্ক আর তা' দিনের পর দিন ধরে চলতে থাকে, তখনই বুঝতে হবে দেহাভ্যন্তরে কোন বড় রকমের গোলযোগ

উপস্থিত হয়েছে। হয়তো বা যক্ষ্মা-বীজাণু সর্বশক্তি নিয়ে ফুসফুসে বাসা বাঁধবার চেষ্টা করছে। এইটাই হ'ল যক্ষ্মার প্রারম্ভিক অবস্থা। এই  অবস্থায় সাধারণতঃ দুর্বলতা বোধ, নৈশ ঘর্ম-এই দুটি লক্ষণই থাকে; অন্য লক্ষণগুলি ঠিক মত ফুটে ওঠে না।

রোগের পরবর্তী অবস্থায় দেহাভ্যন্তরকে সবল ও ক্রিয়াশীল রাখবার জন্যে প্রকৃতি রোগগ্রস্ত অংশের সন্নিহিত অঞ্চলে কফ সৃষ্টি করতে আরম্ভ করে। তাই কাশির সঙ্গে কিছুটা করে কফও নির্গত হয়। রোগবীজাণু ফুসফুসে বাসা বাঁধবার সুযোগ পেয়ে যাবার পর থেকে কফের সঙ্গে কিছুটা করে রক্তের ছিটও দেখা দেয়। বুকে পিঠে রোগী ব্যথা অনুভব করে। শরীরের রস-পদার্থের স্বাভাবিক গতি বাধাপ্রাপ্ত হওয়ায় গলার ঘড় ঘড় শব্দ ও স্বরভঙ্গ দেখা দেয়। সন্ধ্যার দিকে ৯৯/১০০ ডিগ্রী জুরও হয়। রোগীর কখনও কখনও

রক্তবমনও হতে থাকে।

"বেগরোধাৎ ক্ষয়াচ্চৈব সাহসাদ্বিষমাশনাৎ”- অর্থাৎ দেহের রসধাতু বা বায়ুর স্বাভাবিক গতি যদি বাধাপ্রাপ্ত হয় সেক্ষেত্রে মানবদেহ যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হয়। এই বেগরোধের ফলে যে সকল ক্ষেত্রে যক্ষ্মা উৎপন্ন হয় সাধারণতঃ সেই সকল ক্ষেত্রে রোগী খুব অল্প সময়ের মধ্যে অস্থিচর্মসার হয়ে যায় ও খুব অল্প সময়ের মধ্যেই তাদের মনোবল নষ্ট হয়ে যায়।

দেহের সার ধাতু শুক্র। দুগ্ধ মন্থন করে যেভাবে মাখন উৎপন্ন হয় রক্তের সারাংশও তদ্রুপ শুক্রে পরিণত হয়। এই সার ধাতু শুক্রের অত্যধিক অপচয়ের ফলে রক্ত প্রাণহীন হয়ে পড়ে, জীবনীশক্তি হ্রাস পায় ও তার ফলে যক্ষ্মাৰীজাণু সহজেই দেহে বাসা বাঁধবার সুযোগ পেয়ে যায়।

যার যতখানি কাজ করবার শক্তি বা সামর্থ্য আছে, সে যদি ঝোঁকের বশে, অর্থের লোভে বা প্রশংসা কুড়োবার মনোবৃত্তির দ্বারা চালিত হয়ে নিজের শক্তি-সামর্থ্যের চাইতেও বেশী পরিশ্রম করে, সেক্ষেত্রেও তার জীবনীশক্তির অপচয় হেতু যক্ষ্মা রোগ ফুটে ওঠে।

কেউ যদি দীর্ঘদিন ধরে বিষম আহার করে অর্থাৎ মাছ, মাংস, ডিম প্রভৃতি তামসিক খাদ্যের পূর্বে বা পরে দুধ, ক্ষীর প্রভৃতি সাত্ত্বিক খাদ্য গ্রহণ করে সেক্ষেত্রে ওই সকল খাদ্য দেহাভ্যন্তরে যক্ষ্মা অনুকূল প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে।

অথবা, কেউ যদি দিনের পর দিন অক্ষুধায় বা অল্প ক্ষুধায় প্রয়োজনাতিরিক্ত খাদ্য গ্রহণ করে সেটাকেও বলা হয় বিষম আহার ও তার ফলেও যক্ষ্মাৰীজাণু উৎসাহিত হয়।

অথবা, দিনের পর দিন ধরে কেউ যদি প্রয়োজনমত আহার্য না পায় বা অসার খাদ্য গ্রহণ করে তাকেও বলা হয় বিষম আহার। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এইটাই যক্ষ্মা রোগের প্রধান কারণ।

এ ছাড়াও যক্ষ্মারোগের বহু কারণ রয়েছে। যেমন, অতিরিক্ত মাদক দ্রব্য ব্যবহার করে রক্তকে অম্লবিষে জর্জরিত করে ফেলা, অতিরিক্ত আমিষ গ্রহণ করে যকৃৎ, রক্ত ও পাক্যন্ত্র সমূহকে দুর্বল

করে ফেলা, অতিমৈথুনের ফলে বস্তিপ্রদেশের স্নায়ু, শিরা, ধমনী তথা গ্রন্থিসমূহকে দুর্বল করে ফেলা প্রভৃতি, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ, একত্রে বহু মানুষের বাস, যক্ষ্মারোগীর সংস্পর্শ, যক্ষ্মারোগগ্রস্ত জন্তুর দুগ্ধ পান বা যক্ষ্মারোগগ্রস্ত গৃহপালিত পশু-পক্ষীর অণ্ড ও মাংসভক্ষণ প্রভৃতি। এক্ষেত্রে মনে রাখা দরকার যে যে সকল পশু-পক্ষী সম্পূর্ণ রূপে আরণ্য জীবন যাপন করে এই রোগ তাদের ক্বচিৎ দেখা যায় কিন্তু গৃহপালিত গোরু, ঘোড়া, হাঁস, মুরগী প্রভৃতির মধ্যে যক্ষ্মার প্রাদুর্ভাব খুবই দেখা যায়। ওই সকল গৃহপালিত জন্তুর দুগ্ধ বা মাংস দীর্ঘকাল ধরে ব্যবহার করেও যারা যক্ষ্মা রোগগ্রস্ত হয় না, বুঝতে হবে তাদের জীবনীশক্তি খুবই বেশী। গৃহপালিত জীব-জন্তুর মধ্যে ছাগল, ভেড়া, কুকুর, বিড়াল ও খরগোসের মধ্যে এর প্রকোপ বড় একটা দেখা যায় না, আর এই জন্যেই প্রাচীনকালে লোকে যক্ষ্মারোগীকে খরগোসের সান্নিধ্যে থাকবার নির্দেশ দিতেন। হিন্দুদের পুরাণে আছে যে চন্দ্রেরও নাকি একবার যক্ষ্মা হয়েছিল আর সেই সময় তিনি রোগমুক্তির জন্যে একটি খরগোসকে নিজের ক্রোড়ে ধারণ করে রয়েছেন ও এই জন্যে পুরাণে চন্দ্রের আরেকটা নাম হচ্ছে 'শশাঙ্ক'।

অতিরিক্ত মানসিক অবসাদ, জীবন সম্বন্ধে হতাশাও মানুষের জীবনীশক্তিকে নষ্ট করে দেয়। তাই তার ফলে যক্ষ্মারোগ দেখা দিতে পারে। ফুসফুসের যক্ষ্মা জীবনীশক্তিকে দ্রুত বিনষ্ট করে দেয় বলে একেই সব চেয়ে ভীষণ ব্যাধি রূপে ধরা হয়, কিন্তু যক্ষ্মা দেহের যে কোন অংশে হতে পারে আর সব ক্ষেত্রেই কারণ একই। যার কোষ্ঠকাঠিন্য নেই অথবা শুক্রধাতুর অপচয় হয়নি, তার পক্ষে যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা খুবই কম, কারণ একদিকে যেমন তার দেহে অজীর্ণ খাদ্য, মল বা অজীর্ণ পাচক রস পচে দূষিত বায়ু তথা রোগৰীজাণু সৃষ্টি হবার সম্ভাবনা থাকে না, অন্য দিকে তেমনই যথেষ্ট শুক্রের উপস্থিতি নিবন্ধন রক্ত সবল থাকায় জীবনীশক্তিও অটুট থাকে। মনে রাখা দরকার, "মলায়ত্তং বলং পুংসাং শুক্রায়ত্তং চ জীবিতং।”

চিকিৎসা:

প্রত্যূষে: উৎক্ষেপমুদ্রা, কর্মাসন, অগ্নিসার, মৎস্যেন্দ্রাসন, দীর্ঘপ্রণাম, যোগমুদ্রা, ভুজঙ্গাসন, বায়বী মুদ্রা বা বায়বী প্রাণায়াম।

সন্ধ্যায়: সর্বাঙ্গাসন, মৎস্যমুদ্রা, পশ্চিমোত্তানাসন ও অগ্নিসার। নৌকাসন, উৎকট

পথ্য: রস-রক্তাদির ক্ষয় হেতু যক্ষ্মারোগী অল্পকালের মধ্যেই দুর্বল

হয়ে পড়ে, তাই রোগীকে যথেষ্ট পরিমাণ পুষ্টিকর অথচ লঘুপাচ্য খাদ্য গ্রহণ করতে হবে। কখনও এক সঙ্গে বেশী পরিমাণ খাদ্য গ্রহণ করাই উচিত নয়। যে সকল খাদ্যে কোষ্ঠবদ্ধতা দেখা দিতে পারে সেগুলি সযত্নে পরিহার করতে হবে। যকৃতের অবস্থা বুঝে যথেষ্ট পরিমাণ গোদুগ্ধ বা ছাগদুগ্ধ অথবা বাদামের দুগ্ধ বা নারিকেলের দুগ্ধ পান করা বিধেয়। মশলা, মাংস, ডিম, ঘি, আতপচাল প্রভৃতি খাদ্য কোষ্ঠবদ্ধতা রোগ সৃষ্টির সহায়ক। তাই রোগমুক্তি না হওয়া পর্যন্ত সেগুলি বর্জন করতে হবে। অন্যান্য অধিকাংশ রোগের মত এই রোগেও অম্লধর্মী খাদ্য পরিহার করে ক্ষারধর্মী খাদ্য অর্থাৎ সব রকমের টক-মিষ্টি ফল-মূল ও শাক-সব্জীর ঝোল এই রোগে সুপথ্য। রোগের ৰাড়াবাড়ি অবস্থায় নেবু

ও ফলের রস ব্যতিরেকে কোন কিছুই খাওয়া উচিত নয়। অতঃপর রোগের প্রকোপ মন্দীভূত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ধীরে ধীরে পুষ্টিকর অথচ লঘুপাচ্য (যতদূর সম্ভব ক্ষারধর্মী) খাদ্য গ্রহণ করতে হবে। আমিষ-ভোজী অল্প মশলা দিয়ে তৈরী ক্ষুদ্র মৎস্যের ঝোল খেতে পারেন। যক্ষ্মারোগীর পক্ষে চীনী বা গুড়ের পরিবর্তে মধু ব্যবহার করা অধিকতর সঙ্গত। রোগীর পক্ষে রাত্রে ভাত না খেয়ে রুটি ব্যবহার করাই ভাল। দৈনিক প্রায় আড়াই থেকে তিন সের জল যক্ষ্মারোগীর পান করা উচিত। তবে কখনও এক সঙ্গে আধ পোয়ার অধিক নয়। যক্ষ্মা রোগীর পক্ষে নিরম্বু উপবাস কঠোর ভাবে নিষিদ্ধ।

বিধি-নিষেধ: যক্ষ্মা রোগীর পক্ষে শারীরিক পরিশ্রম বর্জনীয়।

অবশ্য খোলা মন নিয়ে উন্মুক্ত প্রান্তরে নিজের সামর্থ্যমত ভ্রমণ করা হিতকর। রোগীর পক্ষে ব্যাপক স্নান আর শীত ও গ্রীষ্মকালে উপযুক্ত সময়ে আতপস্নানও রোগমুক্তির সহায়ক। এই আতপস্নান

যত দূর সম্ভব নগ্ন দেহে সম্পূর্ণ শরীরে হওয়াই বাঞ্ছনীয়। আতপস্নানের পর সম্পূর্ণ শরীর ভিজে তোয়ালে বা গামছায় মুছে নেওয়া উচিত। যক্ষ্মা রোগীকে সব সময়েই নিজের মনোবল ঠিক রাখতে হবে, কিছুতেই রোগ সম্বন্ধে হতাশার ভাব পোষণ করা চলবে না। রোগীর শয়নকক্ষ ও বিছানা বেশ শুষ্ক থাকা দরকার। ঘরের মধ্যে আলোক-বাতাসের যথেষ্ট ব্যবস্থা থাকাও চাই। মোটের উপর রোগীকে যত বেশী প্রাকৃতিক পরিবেশে রাখা যায় ততই মঙ্গল, কেবল দক্ষা হাওয়া বা ঠাণ্ডা হাওয়া থেকে রোগীকে রক্ষা করবার জন্যে সর্বাঙ্গে চাদর মুড়ে রাখলেই চলবে। ঠাণ্ডা লাগার ভয়ে রোগীকে স্নান বন্ধ করে দিলে বা ঘরে বাইরে যেতে না দিলে রোগীর ক্ষতিই হবে, কারণ তাতে করে তার রোগ-প্রতিরোধ শক্তি দ্রুত কমে যেতে থাকবে। যক্ষ্মা রোগীর পক্ষে অতিকথন, স্ত্রী-সংসর্গ, সুস্থ ব্যষ্টির সঙ্গে একত্রে ভোজন প্রভৃতি কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। দেহের লোমচ্ছেদনও না করাই ভাল। তবে শরীরকে সর্বদাই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে।

রাত্রি জাগরণ, দেশ-বিদেশে ভ্রমণ, মানসিক পরিশ্রম প্রভৃতিও রোগীকে বর্জন করতে হবে। রোগীর রক্তবমন হ'লে ভীতিগ্রস্ত না হয়ে  সঙ্গে সঙ্গে ব্যাপক শৌচক্রিয়া করে নিয়ে মাথা ধুয়ে ফেলতে হবে ও সুস্থতা না আসা পর্যন্ত বুকের উপর একটি ভিজে তোয়ালে রাখতে হবে। ওই তোয়ালে মধ্যে মধ্যে শীতল জলে ভিজিয়ে নিংড়ে নিয়ে বুকের উপর রেখে দিতে হবে।

কয়েকটি ব্যবস্থা:

১) বেড়েলা, গাম্ভারী, অশ্বগন্ধা ও পুনর্নবা সম পরিমাণে একত্রে শুষ্ক ও চূর্ণ করে দু'বেলা মধু সহ সেব্য। সেবনান্তে কিছুটা পরে এক বলকের মত ছাগদুগ্ধ পান করলে এই রোগে দ্রুত ফল পাওয়া যায়।

২) খোসা সহ বড় এলাচ-চূর্ণ ও দারুচীনী-চূর্ণ সমান ভাবে মিশিয়ে মধু সহ এক চামচ পরিমাণ সন্ধ্যায় সেব্য ও সকালে বেলপাতার

রস, শিউলি পাতার রস ও কয়েৎবেল পাতার রস সম ভাবে মিশিয়ে এক তোলা পরিমাণ সেব্য।

৩) গোলা পায়রা কেটে তার পালক ছাড়িয়ে টুকরো টুকরো করো ও রোদে শুকোতে দাও। সেই শুকনো মাংস চূর্ণ করো ও ওই চূর্ণ ছয় রতি পরিমাণ মধু সহ প্রত্যহ প্রাতে রোগীকে খেতে দাও।

সূচীপত্র

# যৌন অক্ষমতা ও ক্লীবতা

লক্ষণ : অল্প সময়ের মধ্যে রেতঃস্খলন, স্নায়বিক সুখ বোধের অভাব ও প্রজননশক্তি নষ্ট হয়ে যাওয়া, মৃত অথবা অল্পায়ু সন্তান জন্মগ্রহণ করা প্রভৃতি এই ব্যাধির লক্ষণ।

কারণ: সর্ব ক্ষেত্রে না হোক, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এটি অসংযমীদের রোগ। এই রোগের কারণ নানাবিধ।

১) মানসিক কারণ: অতিরিক্ত কাম চিন্তার ফলে শুক্রস্থলী পূর্ব থেকেই পূর্ণ হয়ে থাকলে অল্প সময়ের মধ্যে রেতঃস্খলন হয়ে যায়। একে বলা হয় মানসিক ক্লৈব।

২) শরীরে অত্যধিক অম্লবিষ বা পিত্তবিষ থাকলেও অল্প সময়ের মধ্যে রেতঃস্খলন হতে পারে। এরূপ ক্ষেত্রে দেহস্থ পিত্তবিষ' নারীর আর্তব বা স্ত্রীৰীজকে ধ্বংস করে দিয়ে ভ্রূণোৎপত্তির সম্ভাবনা নষ্ট করে দেয়। একে বলা হয় পিত্তজ ক্লৈব্য।

৩) পুরুষ ও নারীর মধ্যে অত্যধিক তিক্ততাপূর্ণ সম্পর্ক থাকলে সেই মানসিক প্রভাবে দ্রুত রেতঃস্খলন হতে পারে ও ভ্রূণসৃষ্টির সম্ভাবনা নষ্ট হয়ে যেতে পারে। একে বলা হয় মানসিক দোষজ ক্লৈব্য।

৪) কৈশোরে বা যৌবনে হস্তমৈথুনাদি কদভ্যাসের ফলে অতিরিক্ত শুক্রক্ষয় হয়ে গেলে অথবা বিবাহিত জীবনে অসংযমের ফলে শুক্র তরল হয়ে যায় ও ধাতুদৌর্বল্যের লক্ষণ দেখা দেয়। এটাও এক জাতীয় যৌন অক্ষমতা ব্যাধি। একে বলা হয় শুক্রক্ষয়জ ক্লৈব্য।

৫) যাঁরা অতিরিক্ত মানসিক বা আধ্যাত্মিক সাধনা করেন বা ধ্যান-ধারণা-প্রাণায়ামাদিতে অধিক সময় রত থাকেন তাঁদের শুক্রের অতিরিক্ত ঊর্ধ্বগতি হওয়ার ফলে মুষ্ক (testes) যথেষ্ট পরিমাণে পুংবীজ নির্মাণ করবার সুযোগ পায় না, কারণ কাম চিন্তা না থাকলে পুংৰীজ যথাযথভাবে সৃষ্ট হতে পারে না। এই জন্যে সাধারণতঃ দেখা যায়, বৈজ্ঞানিক বা যাঁরা অত্যধিক মস্তিষ্কপ্রধান তাঁদের হয় একেবারেই সন্তানাদি হয় না অথবা হলেও তারা ক্ষীণায়ু হয়। একে বলা হয় শুক্র- নিরোধজ ক্লৈব্য।

৬) পুরাতন প্রমেহ বা উপদংশাদি যৌন ব্যাধিতে ভোগার ফলে পুরুষ বা নারীর মধ্যে যে ক্লৈব্য দেখা দেয় তাকে বলা হয় উপদংশজ ক্লৈব্য।

৭) অতিরিক্ত অসংযম ও মৈথুনক্রিয়ার ফলে বস্তিদেশের জননেন্দ্রিয়ের ধারক স্নায়ুসমূহ দুর্বল বা ছিন্নভিন্ন হয়ে গেলে জননযন্ত্রের উত্থানশক্তি রহিত হয়ে যায় ও তা' অত্যন্ত দুর্বল ও ক্ষীণাঙ্গ হয়ে যায়। এর ফলে যে ক্লৈব্য হয় তাকে বলা হয় ধ্বজভঙ্গ ক্লৈব্য ('ধ্বজ' শব্দের অর্থ জননেন্দ্রিয়)।

৮) জন্মগত কারণে যাদের পিতৃগ্রন্থি, মাতৃগ্রন্থি, মুষ্ক, ডিম্বকোষ প্রভৃতি দুর্বল থাকে তাদের ব্যাধিকে জন্মগত ক্লৈব্য ৰলা হয়। শল্যচিকিৎসা বা উগ্র মানসিক সাধনা ব্যতিরেকে এ রোগ দূর করা সম্ভব নয়। অবশ্য শল্যচিকিৎসা বা উগ্র মানসিক সাধনার দ্বারা পুরুষত্বকে নারীত্বে বা নারীত্বকে পুরুষত্বে পরিণত করা অসম্ভব নয়।

অতিরিক্ত অসংযমের ফলে নারীদের শুক্রক্ষয়জ ক্লৈব্য দেখা দিতে পারে। এইরূপ রোগগ্রস্তা নারীরা সহবাসকালে তলপেটে অত্যন্ত যন্ত্রণা অনুভব করে ও স্থায়ী কোষ্ঠবদ্ধতায় ভুগে থাকে।

অতিরিক্ত অসংযমের ফলে নারীদের ধ্বজভঙ্গ ব্যাধিও দেখা দিতে পারে। এইরূপ রোগিণীদের সহবাস কালে বিশেষ কোন স্নায়বিক অনুভূতি হয় না।

চিকিৎসা:

প্রত্যুষে : উৎক্ষেপমুদ্রা, ৰন্ধত্রয়, ময়ূরাসন, কর্মাসন, আন্তসী মুদ্রা বা আন্তসী প্রাণায়াম।

সন্ধ্যায়: সর্বাঙ্গাসন, মৎস্যমুদ্রা, পদহস্তাসন, মৎস্যেন্দ্রাসন, ৰজ্রাসন।

যে সকল ক্ষেত্রে ক্লীবতা অন্য কোন ব্যাধিরই পরিণতি মাত্র সে সকল ক্ষেত্রে সেই মূল ব্যাধিটির চিকিৎসা করতে হবে ও সেই রোগটি সারার সঙ্গে সঙ্গে এই রোগটিও সেরে যাবে।

পথ্য: যকৃতের সামর্থ্য বুঝে রোগীর সর্ব প্রকার পুষ্টিকর খাদ্যই গ্রহণ করা উচিত। প্রত্যহ প্রচুর পরিমাণে জলপান (৪/৫ সের) করা উচিত ও একাদশী, পূর্ণিমা ও অমাবস্যার উপবাস-বিধি মেনে চলা উচিত।

ভাত ও রুটির সঙ্গে যথেষ্ট পরিমাণে ঘি বা মাখন ব্যবহার করা উচিত। যকৃৎ ভাল থাকলে দিনে এক সের দুগ্ধ পান করা উচিত। এই ব্যাধিতে লাউ, ছাঁচি কুমড়ো, কলমী শাক অত্যন্ত সুপথ্য।

বিধি-নিষেধ: পূর্বেই বলেছি, সর্ব ক্ষেত্রে না হোক, অধিকাংশ

ক্ষেত্রেই এটি একটি অসংযমের ব্যাধি। তাই চিন্তায় ও কর্মে সর্বদা সংযত থাকা দরকার। রোগমুক্তি না হওয়া পর্যন্ত নারী সঙ্গ পরিহার করে চলা বাঞ্ছনীয়। রোগগ্রস্ত অবস্থায় নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্যের বিধিগুলিও মেনে চলতে হবে। স্নান বিধি ও আতপস্নান বিধিও যথাযথভাবে পালন করে চলা উচিত।

কয়েকটি ব্যবস্থা:

১) মাষকলাই ঘিয়ে ভেজে দুধে ফুটিয়ে শর্করা সহ পান করলে,

অথবা

২) শালম মিশ্রী (এক ধরণের কাবুলী ফল) এক তোলা, দুধ ও মিছরীর সঙ্গে সেবন করলে,

অথবা

৩) এক ইঞ্চি পরিমাণ তুলসীর মূল পাণের সঙ্গে চর্বণ করে খেলে,

অথবা

৪) দুগ্ধ সহ শিমূলমূল-চূর্ণ পান করলে দু'/তিন সপ্তাহের মধ্যেই: এই রোগের হাত থেকে hu পাওয়া যায়।

৫) ধ্বজভঙ্গ রোগে নাগেশ্বরের (নাগকেশরের) আতর মালিশ করলে সুন্দর ফল পাওয়া যায়।

৬) ধাতুদৌর্বল্য, যৌন অক্ষমতা ও ক্লীবতা ব্যাধির পক্ষে ভূমিকুষ্মাণ্ড-চূর্ণ একটি সুন্দর ঔষধ।

প্রস্তুতপ্রণালী: ভূমিকুষ্মাণ্ড খণ্ড খণ্ড করে কেটে ছায়ায় শুকোতে

দাও। দ্বিতীয় দিন পূর্ব দিনকার খণ্ডগুলিতে আরও কিছু ভূমিকুষ্মাণ্ডের রস ঢেলে দিয়ে আবার শুকোতে দাও। এই ভাবে সাত দিন শুকিয়ে অতঃপর শুষ্ক ভূমিকুষ্মাণ্ডকে চূর্ণ করে ওই চূর্ণ চার আনা মাত্রায় নিয়ে তৎ সহ এক তোলা ঘৃত ও অর্দ্ধ ছটাক দুগ্ধ মিশিয়ে প্রত্যহ প্রত্যুষে পান করতে হবে। সাধারণতঃ ২/৩ সপ্তাহের মধ্যে রোগ সেরে যায়।

৭) পুঁইয়ের শিকড় জলে বেটে চন্দনের মত হয়ে গেলে তার সঙ্গে এক পোয়া জল মিশিয়ে সরবতের মত পান করতে হবে ও অতঃপর জলে ভেজানো মাষকলাইয়ের দাল শর্করা সহ সেবন করলে পুরুষহীনতায় বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। .

৮) রুই মাছের মধ্যমাংশ ঘিয়ে ভেজে অথবা পুঁটিমাছ ঘিয়ে ভেজে ক্রমান্বয়ে দু'/তিন সপ্তাহ ধরে ঔষধ রূপে ভক্ষণ করলে শুক্রতারল্যজনিত ক্লীবতা দূরীভূত হয়।

রক্তচাপ রোগ (Blood Pressure)

লক্ষণ : সুনিদ্রার অভাব, রাত্রে বার বার পেশাৰ করতে ওঠা, মাথা ধরা ও মাথা ঘোরা, বুক ধড়ফড় করা বা বুকে বেদনা বোধ করা প্রভৃতি।

কারণ:

১) সাধারণতঃ যারা শারীরিক পরিশ্রম কম করে তাদের খাদ্যতালিকায় চর্বি জাতীয় বস্তু, ঘি, তেল প্রভৃতি অধিক পরিমাণে থাকলে শারীরিক ক্রিয়াশীলতার অভাবে সেই চর্বি দগ্ধ হয়ে শক্তি বা উত্তাপে পরিণত হবার সুযোগ পায় না। এই উদ্বৃত্ত চর্বি শরীরকে মাংস ও চর্বিপিণ্ডে পরিণত করে দেয়। এর ফলে দেহের বিভিন্ন যন্ত্র ও গ্রন্থিগুলির উপর অকারণ চাপ পড়ে। এই উদ্বৃত্ত চর্বি শিরা-ধমনীর অভ্যন্তরে জমবার সুযোগ পেলে তন্মধ্যস্থ রক্তের গতিপথ সঙ্কীর্ণ হয়ে যায়। স্নায়ু-ধমনীগুলি যথাযথভাবে রক্তধারা সঞ্চালিত করে হৃদ্যন্ত্রকে ঠিকভাবে সাহায্য করতে অক্ষম হয়ে পড়ে। এই অবস্থায় রক্তধারাকে ঠিকভাবে প্রবাহিত রাখবার জন্যে হৃদ্যন্ত্র অতিক্রিয় হয়ে যায়।

২) যারা শারীরিক পরিশ্রম করে না কিন্তু যথেষ্ট পরিমাণে পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ করে, তাদের দেহে রক্তাধিক্য দেখা দেয় ও ক্রমে এই রক্ত মাংস ও মেদে পরিণত হয়ে ঠিক প্রথমোক্ত ভাবেই স্নায়ু-ধমনীর ক্রিয়াশীলতাকে ব্যাহত করে ও হৃদ্যন্ত্রের উপর অতিরিক্ত রক্তের চাপ সৃষ্টি করে। এইভাবে যাদের দেহে অতিরিক্ত রক্তের চাপ সৃষ্টি হয় ও হৃদপিণ্ডের উপর রক্তের চাপ বর্দ্ধিত হয়

তাদের দেহের বিভিন্ন গ্রন্থি ও  যন্ত্র অনেক সময় অতিক্রিয় হয়ে অত্যধিক ক্রোধ বা কামের উদ্রেক করে। তাই এই ধরণের রোগীর রক্তচাপবৃদ্ধি রোগের সঙ্গে সঙ্গে ক্রোধ ও কামুকতাও বেড়ে যায়। কখনও কখনও অতি ক্রোধ বা অতি কামুকতা ভাব জাগার সঙ্গে সঙ্গে শিরা-ধমনী ছিঁড়ে রোগীর মৃত্যুও হতে পারে।

৩) যারা শারীরিক পরিশ্রম কম করে কিন্তু অত্যধিক পরিমাণে আমিষ বা উদ্ভিজ্জ প্রোটিন খেয়ে থাকে তাদের শরীরে এই উদ্বৃত্ত প্রোটিন এক অনর্থের সৃষ্টি করে। এই অতিরিক্ত প্রোটিন রাখবার স্থান মানব শরীরে নেই, কারণ মানবশরীরে এর প্রয়োজন নেই। তাই দেহযন্ত্র একে শরীর থেকে নিষ্কাশিত করে দিতে চায়। এই প্রোটিনের ফলে রক্তের ক্ষার ভাগ যায় কমে ও অম্লভাগ যায় বেড়ে। রক্তের অম্ল ভাগ বৃদ্ধির ফলে দেহস্থ রক্তোৎপাদক ও রক্ত-পরিষ্কারক গ্রন্থিগুলি (যকৃৎ, কিনি প্রভৃতি) দুর্বল হয়ে যায় ও তাদের এই দুর্বলতার জের স্বরূপ শেষ পর্যন্ত শিরা-ধমনীগুলিও কঠিন ও দুর্বল হয়ে পড়ে। এই কঠিন ও দুর্বল শিরা-ধমনীগুলি যথাযথভাবে রক্ত পরিবহনে অসমর্থ হয়ে পড়ে ও তার ফলে

হৃদ্যন্ত্রের উপর অতিরিক্ত রক্তের চাপ পড়তে থাকে। এই অবস্থায় দেহযন্ত্রকে স্বাভাবিক রাখবার জন্যে হৃদ্যন্ত্রকে অত্যধিক পরিশ্রম করতে হয়। হৃদপিণ্ডের এই অতিক্রিয়তা দুর্বল শিরা-ধমনী সহ্য করতে পারে না ও তা ফেটে গিয়ে হতে থাকে আভ্যন্তরীণ রক্তক্ষরণ।

৪) নানাবিধ কারণে শরীরের রক্তোৎপাদক ও রক্ত-পরিষ্কারক যন্ত্রগুলি দুর্বল হয়ে পড়তে পারে। রক্তোৎপাদক যন্ত্রগুলি বেশী দুর্বল হয়ে পড়লে শরীরে প্রয়োজনীয় রক্তের অভাব ঘটে; সে অবস্থাতেও মানুষ অনিদ্রা, মাথা-ধরা, মাথা-ঘোরা, অত্যধিক শারীরিক দুর্বলতা প্রভৃতি উপসর্গে কষ্ট পেতে থাকে। একে বলা হয় রক্তের নিম্নচাপ ব্যাধি।

সূচীপত্র

# রক্তচাপ রোগ

প্রত্যুষে: উৎক্ষেপমুদ্রা, কর্মাসন, যোগমুদ্রা, দীর্ঘপ্রণাম, ভুজঙ্গাসন, অগ্নিসার, বায়বী মুদ্রা বা বায়বী প্রাণায়াম।

সন্ধ্যায়: কর্মাসন, যোগমুদ্রা, দীর্ঘপ্রণাম, ভুজঙ্গাসন, অগ্নিসার ও উপবিষ্ট উড্ডয়ন।

আচার্য্যোক্ত পদ্ধতিতে ঈশ্বর-প্রণিধান করলেও অত্যদ্ভুত ফল পাওয়া যায়। বস্তুতঃ রোগীর যতদিন আসন-মুদ্রা করবার সামর্থ্য না আসছে ততদিন কেবলমাত্র ঈশ্বর-প্রণিধানই একমাত্র করণীয়। অন্য ভাষায় বলা যেতে পারে, ঈশ্বর-প্রণিধানই এর একমাত্র ঔষধ, আসন- মুদ্রাগুলি অনুপান মাত্র। এই রোগে ব্যাপক স্নান রোগীকে বিশেষ সাহায্য করে থাকে।

পথ্য: এই রোগে অম্লধর্মী খাদ্য বর্জন করে চলতে হবে ও ক্ষারধর্মী খাদ্যের পরিমাণ বাড়াতে হবে। তাই যত দূর সম্ভব ভাত, ডাল ও

রুটির পরিমাণ কমিয়ে দিয়ে ফলমূল ও শাক-সব্জীর ঝোল খাওয়াই বাঞ্ছনীয়। আমিষ খাদ্য বর্জন করতে হবে। ভাজা, পোড়া ও মিষ্টি জিনিসও এই রোগে ক্ষতিকারক। প্রয়োজন ৰোধে অল্প পরিমাণ গুড় বা মধু ব্যবহার করা যেতে পারে।

ধীরে ধীরে শারীরিক পরিশ্রমের মাত্রাও বাড়িয়ে দিতে হবে ও মানসিক পরিশ্রমের মাত্রা কমিয়ে দিতে হবে। যাদের রক্তের চাপ নিম্ন তাদের রোগ না সারা পর্যন্ত শারীরিক পরিশ্রম কমিয়ে দিতে হবে। এই রোগে উপবাস অত্যন্ত হিতকর। তাই রোগী অবশ্যই একাদশী, পূর্ণিমা ও অমাবস্যায় উপবাস করতে হবে আর উপবাসকালে কেবলমাত্র জলই পান করা যেতে পারে। যাদের শারীরিক সামর্থ্য অল্প তারা এই জলের সঙ্গে নেবুর রস মিশ্রিত করে নিতে পারে। নিম্নচাপ রোগীদের পক্ষে উপবাসের দিন দুধ, ফলের রস প্রভৃতি ব্যবহার করা উচিত। চর্বিবাহুল্যের দরুণ যাদের রক্তচাপ বর্ণিত হয়েছে তাদের পক্ষে দুধের  পরিবর্তে ঘোল অথবা অল্প পরিমাণে নারিকেলের দুধ ব্যবহার করা বাঞ্ছনীয়। রোগীকে নেশার জিনিস অথবা যে খাদ্যে কোষ্ঠকাঠিন্য হতে পারে

অথবা যার ফলে শরীরে মেদাধিক্য দেখা দিতে পারে এরূপ খাদ্য সযত্নে পরিহার করতে হবে। ক্রোধ ও মৈথুন থেকেও দূরে থাকতে হৰে। হৃদ্রোগের সাধারণ বিধি-নিষেধগুলি এই রোগেও মেনে চলতে হবে।

কয়েকটি ব্যবস্থা:

১) ছোট এলাচচূর্ণ এক চামচ (ছোট) কিঞ্চিৎ মধু সহ দু'ৰেলা সেব্য।

২) সর্পগন্ধা* (চন্দ্রা, চন্দ্রিকা বা ছোট চাদর) পাতার রস এক চামচ কিঞ্চিৎ মধু সহ,

অথবা

৩) সর্পগন্ধামূল-চূর্ণ এক আনা বা দুই আনা কিঞ্চিৎ মধু ও ত্রিফলার জল সহ দুই বেলা সেব্য।

৪) ভূমিকুষ্মাণ্ড-চূর্ণ এক আনা কিঞ্চিৎ মধু সহ দুই ৰেলা সেব্য।

৫) সর্পগন্ধার মূল-চূর্ণ (শুল্ক) এক আনা বা দুই আনা মিছরীর জল সহ দুই বেলা সেব্য।

* হিন্দী নাম 'ছোট চাঁদ' ও ইংরেজী নাম Rauwolfa Serpentina

সূচীপত্র

# শ্লীপদ বা গোদ (Elephantitis)

লক্ষণ: পা ফুলে ওঠা, পায়ের চামড়া ক্রমশঃ পুরু হয়ে যাওয়া ও তাতে ভাঁজ পড়া, মধ্যে মধ্যে জ্বর, টাটানি ব্যথা এই রোগের

লক্ষণ। সাধারণতঃ এই রোগের আক্রমণ স্থল পায়েই। তবে ক্বচিৎ কখনও হাতেও এই ব্যাধির আক্রমণ দেখা যায়। এই রোগে পায়ের চেহারা অনেকটা হাতীর পায়ের মত হয়ে যায় ৰলে একে ইংরেজীতে Elephantitis ও হিন্দুস্তানীতে 'ফীলপাৰ' ৰলা হয়।

কারণ : শরীরের রক্তবহা নাড়ীর পাশে পাশে আরেক রকমের নাড়ী আছে যেগুলিকে ৰলা হয় শুক্রবহা নাড়ী। এই নাড়ীগুলি শরীরের সার পদার্থ শুক্রকে দেহের বিভিন্ন স্থানে পৌঁছিয়ে দিয়ে স্নায়ু, গ্রন্থি ও কোষসমূহকে সজীব রাখে। এই শুক্রবহা নাড়ীগুলি শুক্রগ্রন্থিসমূহে শুক্র প্রেরণ করে ও সেখানে উৎপন্ন প্রাণৰীজসমূহের সাহায্যে দেহের রোগ প্রতিরোধশক্তি তথা অস্তিত্ব অব্যাহত রাখে। কোষ্ঠবদ্ধতা অথবা দেহস্থ অতিরিক্ত পিত্ত বা অম্লবিষ নিৰন্ধন বা অতিরিক্ত শুক্রক্ষয় বা সন্তান প্রসবের ফলে অথবা পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে রক্ত নিঃসার ও তৎসহ দূষিত হয়ে পড়লে রক্তে এক বিশেষ শ্রেণীর কীটাণু সৃষ্ট হয়। উক্ত কীটাণুগুলি শুক্রবহা নাড়ীর অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হয়ে যখন সেখানে বাসা বাঁধবার সুযোগ পায় তখন শুক্রসঞ্চালন ৰাধা প্রাপ্ত হয় ও

নাড়ীগুলি স্ফীত হয়ে ওঠে। নাড়ীর এই স্ফীতিই শ্লীপদ রোগের আকার ধারণ করে।

**চিকিৎসা:**

প্রত্যুষে: উৎক্ষেপমুদ্রা, পদহস্তাসন, অগ্নিসার, উড্ডয়ন, দীর্ঘপ্রণাম, উৎকটাসন, যোগমুদ্রা ও নৌকাসন।

সন্ধ্যায়: সর্বাঙ্গাসন, মৎস্যমুদ্রা, মৎস্যেন্দ্রাসন, অগ্নিসার। রোগী স্নানবিধি, জলপানবিধি ও আতপস্নান বিধি যথাযথভাবে মেনে চলবে।

পথ্য: যকৃতের অবস্থা বুঝে সব রকমের পুষ্টিকর খাদ্যই ব্যবহার করা যেতে পারে। সব রকমের ফলমূল, বিশেষ করে টক ফল অত্যন্ত সুপথ্য। একাদশী, পূর্ণিমা ও অমাবস্যায় উপবাস বিধি মেনে চলতে হবে।

বিধি-নিষেধ: নিয়মিত পরিশ্রম, খাদ্য ও চিন্তায় সংযম রোগীর

পক্ষে অত্যাবশ্যক। হেলেঞ্চা ও পুনর্নবার শাক এই রোগে হিতকর। রোগী যত দূর সম্ভব রোগগ্রস্ত স্থানে ফ্লানেল জড়িয়ে রাখবে। রাত্রে শয়নের পূর্বে গরম ফ্লানেলের সেঁক দেবে। রোগগ্রস্ত স্থানে কদম পাতা জড়িয়ে রাখার অথবা রাত্রে শয়নের পূর্বে নিশাদল-মিশ্রিত জলে ন্যাকড়া ভিজিয়ে সেই ন্যাকড়া জড়িয়ে রাখার ফল ভালই হয়ে থাকে।

কয়েকটি ব্যবস্থা:

১) এক চামচ তিল তৈল বা খাঁটি সর্ষপ তৈলের সঙ্গে সম পরিমাণ গুলঞ্চের রস মিশ্রিত করে প্রত্যহ প্রতুষে খালি পেটে 'পান করলে,

অথবা

২) ছাগমূত্র বা গোমূত্রের সঙ্গে হরীতকীচূর্ণ মিশ্রিত করে প্রত্যহ প্রত্যুষে খালি পেটে পান করলে শ্লীপদ রোগ প্রশমিত হয়।

সূচীপত্র

# শ্বাসরোগ বা হাঁপানি (Asthma)

লক্ষণ: কফাশ্রিত বায়ুর প্রভাবে শ্বাসক্রিয়ার কষ্ট বোধ করাই এই রোগের লক্ষণ। রোগের আক্রমণ সাধারণতঃ শেষ রাত্রের দিকেই হয়ে থাকে।

কারণ: শ্বাসবায়ু যে সূক্ষ্ম শ্বাসনালীর সাহায্যে ফুসফুসের দিকে

প্রবাহিত হয় সেই শ্বাসনালী অনাহত চক্রাশ্রিত গ্রন্থিগুলির দুর্বলতার ফলে কফপূর্ণ হয়ে থাকায় বায়ুর গমনাগমন ব্যাহত হয়। দুর্বল শ্বাসনালী সংকুচিত হয়ে থাকলে দেহস্থ অঙ্গারাম্ল

(carbon-dioxide) যথাযথভাবে বাইরে যেতে পারে না ও দেহাভ্যন্তরস্থ ওই দূষিত বায়ু শরীরে অজস্র পরিমাণে রোগৰীজাণু সৃষ্টিতে সাহায্য করতে থাকে। কেবলমাত্র অনাহত চক্রাশ্রিত গ্রন্থিগুলির দুর্বলতায় স্থায়ীভাবে শ্বাসরোগ দেখা দেওয়া সম্ভব নয়। এর সঙ্গে গৌণভাবে বিশুদ্ধ চক্রাশ্রিত গ্রন্থিগুলি ও মুখ্যভাবে মণিপুর চক্রাশ্রিত গ্রন্থিগুলির দুর্বলতা থাকলে তবেই শ্বাস রোগ আত্মপ্রকাশ করে। জঠরাগ্নির দুর্বলতায় অল্পবিষে রক্ত দূষিত হয়ে পড়লে বা কোষ্ঠকাঠিন্য থাকলে দেহের অন্যান্য যন্ত্রগুলি দুর্বল হয়ে পড়ে। সে অবস্থায় ফুসফুসের দুর্বলতার ফলে ফুসফুস-নিয়ন্ত্রক স্নায়ুগুলিও দুর্বল হয়ে পড়ে ও শ্বাসনালীও দুর্বল হয়ে যায়। শ্বাসরোগ তখনই ঠিক ভাবে ফুটে ওঠে।

চিকিৎসা:

প্রত্যুষে: উৎক্ষেপমুদ্রা, নৌকাসন, পদহস্তাসন, মৎস্যেন্দ্রাসন ও বায়বী মুদ্রা। ভোরে ও দ্বিপ্রহরে ব্যাপক স্নান।

সন্ধ্যায়:

সর্ব্বাঙ্গাসন, পশ্চিমোত্তানাসন, যোগমুদ্রা, ভস্ত্রিকাসন, উড্ডয়ন।

পথ্য: রোগী টক বা মিষ্ট দেশী ফল অথবা কয়েক ঘণ্টা জলে

ভিজিয়ে রাখা মেওয়া ফল জলখাবার রূপে ব্যবহার করবে। নেবুর রস অল্প মাত্রায় দিনে অনেক বার ব্যবহার করবে। রোগী কখনও একেবারে পেট ভর্তি করে খাবে না। পেট যাতে পরিষ্কার থাকে সেদিকে সর্বদা নজর রাখবে কারণ কোষ্ঠকাঠিন্যের সঙ্গে সঙ্গে এই রোগের বৃদ্ধি হয়। খাদ্য হিসেবে অল্প পরিমাণ গরম ভাত বা রুটির সঙ্গে যথেষ্ট পরিমাণ শাক-সব্জীর ঝোল, দুধ, দধি বা ঘোল ব্যবহার করবে। বস্তুতঃ সমস্ত ক্ষার জাতীয় খাদ্যই এই রোগে উপকারী। ঘি, তেল, ভাত, ডাল, রুটি ও সমস্ত আমিষ খাদ্য অম্লধর্মী। তাই সেগুলি কম খাবে।

বিধি-নিষেধ: এই রোগে দুধ একটি প্রধান পথ্য। শ্বাসরোগীর

পক্ষে রাত্রের আহার যত তাড়াতাড়ি সেরে ফেলা যায় (অবশ্যই সূর্যাস্তের পর দেড় ঘন্টার মধ্যে অর্থাৎ রাত্রি ৭.৩০ মিঃ বা ৮টার মধ্যে) ততই ভাল, কারণ তা'তে করে শেষ রাত্রের মধ্যে সমস্ত খাদ্যান্ন জীর্ণ হয়ে যাওয়ায় পেট হালকা হওয়ার ফলে শেষ রাত্রে হাঁপানির টান প্রৰলভাবে দেখা দিতে পারে না। মনে রাখা দরকার পেটে বেশী ক্ষুধা থাকলে হাঁপানির টান বাড়তে পারে না আর তাই রোগের বেশী ৰাড়াবাড়ি অবস্থায় যত বেশী উপবাস দেওয়া যায় ততই মঙ্গল।

শ্বাসরোগীকে সমস্ত রকমের নেশার জিনিস থেকে কঠোরভাবে দূরে থাকতে হবে, এমনকি যে মানুষ দিনে তিন পোয়ার চেয়ে কম দুধ খায় তার পক্ষে এক পেয়ালা চা-ও পান করা চলবে না। সর্ব প্রকার আমিষ খাদ্যও বর্জন করতে হবে।

যার পক্ষে আমিষ ত্যাগ করা সম্ভব নয় সে অল্প পরিমাণে ক্ষুদ্র টাটকা মৎস্যের ঝোল খেতে পারে। যে দেশে নিরামিষ খাদ্য পাওয়া  দুষ্কর সে দেশের রোগী আহারান্তে হরিতকী (myrobalan) অথবা অন্য কোন প্রকার কোষ্ঠ-পরিষ্কারক দ্রব্য ব্যবহার করে নিজেকে কোষ্ঠকাঠিন্যের হাত থেকে রক্ষা করে চলবে। মিষ্টান্ন ও ভাজা-পোড়া জিনিসও শ্বাসরোগীর পক্ষে ক্ষতিকারক। কি গ্রীষ্ম, কি শীত সকল ঋতুতেই রোগীকে উন্মুক্ত প্রান্তরে যথেষ্ট পরিমাণে ভ্রমণ করতে হবে।

কয়েকটি ব্যবস্থা:

১) এক তোলা শ্বেত পুনর্নবার শাখা-শিকড় আড়াইটা গোল মরিচের সঙ্গে গঙ্গাজলে (নদীর জলে) বেটে সোমবারে অভুক্ত অবস্থায় স্নানান্তে উত্তর মুখে বসে খেলে শ্বাসরোগে চমৎকার ফল পাওয়া যায়।

২) পাঁচ তোলা গব্য ঘৃত কাঁসার বাটিতে ফুটিয়ে নাও। অন্য

একটি পাত্রে আড়াই তোলা আদার রস গরম করে ওই আদার রস ঘিয়ে

ফেলে দিয়ে কাঁসার থালা চাপা দাও। ঘি-য়ের কল্কলানি থেমে যাবার

পর দুই তোলা ঘি আধ পোয়া গরম দুধের সঙ্গে রোগ যন্ত্রণার সময়

রোগীকে খেতে দাও। সঙ্গে সঙ্গে প্রচুর শ্লেষ্মা (কফ) উঠে রোগী আরাম

পাবে। একটানা পনের দিন ব্যবহার করলে রোগ সম্পূর্ণ সেরে যেতে  পারে।

৩) একটা কঙ্কটে ব্যাঙ (frog) ধরো ও তাকে কেটে তার হার্টটা (heart) বের করে নাও। সেই হার্টকে চার ভাগে বিভক্ত করে প্রত্যহ রোগীকে হার্টের সেই টুকরোগুলির একটি টুকরো একটি করে কলার মধ্যে পুরে অভুক্ত অবস্থায় স্নানান্তে খেতে দেবে। তাতে শ্বাসরোগে ভাল ফল পাওয়া যায়।

৪) ৬/৭টা আরশোলা আধ সের জলে ফুটিয়ে আধ পোয়া থাকতে নাৰিয়ে ভাল ভাবে ছেঁকে গরম গরম এক ছটাক মাত্রায় দিনে দু'বার পান করলে শ্বাসরোগ প্রশমিত হয়।

৫) ময়ূরপুচ্ছ-ভস্ম এক আনা পরিমাণ মধু সহ ধীরে ধীরে লেহন করে খেলে শ্বাসকষ্ট অত্যল্প কালের মধ্যে দূরীভূত হয়।

৬) পুরাণো ইক্ষুগুড় ও খাঁটি সরিষার তেল সমান মাত্রায় নিয়ে (ধরা যাক এক তোলা, এক তোলা) এক সঙ্গে মিশিয়ে ক্রমাগত একুশ (২১) দিন ভোরে খালি পেটে লেহন করে খেলে শ্বাসরোগে সুন্দর ফল পাওয়া যায়।

সূচীপত্র

# শ্বিত্র (শ্বেত কুষ্ঠ বা ধবল)

লক্ষণ: শ্বিত্র রোগটি কুষ্ঠের অন্তর্ভুক্ত হলেও জীবনীশক্তির পক্ষে ততটা ঘাতক নয় ও রসস্রাবী নয় বলে সংক্রামকও নয়। সপ্ত ধাতুর বিকৃতির ফলে যে কুষ্ঠ সৃষ্ট হয় তা' মানুষের শরীর ও মনে অল্প কালের মধ্যেই মারাত্মক প্রভাব বিস্তার করে, কিন্তু এই শ্বেত কুষ্ঠ বা শ্বিত্রে সাধারণতঃ রক্ত, মাংস ও মেদ কেবলমাত্র এই তিনটি ধাতুই বিকৃতিপ্রাপ্ত হয়।

শরীরের বিভিন্ন স্থানে- বক্ষে, মুখে ও পায়ের গোড়ালিতে ও

দেহের শেষাংশে অর্থাৎ ঠোঁটে, আঙ্গুলে প্রথমে লালচে রঙের দাগ দেখা দেয় ও দেখে মনে হয় ওই সকল স্থানের চামড়া যেন কিছুটা

পাতলা হয়ে গেছে। পরে ওই লাল দাগগুলি ধীরে ধীরে শাদা হয়ে যায়। আগেই বলেছি, রোগটি ছোঁয়াচে নয়, কিন্তু শরীরের বিভিন্ন অংশে সৃষ্ট ওই শাদা দাগগুলি এমনই একটি ভীষণতা সৃষ্টি করে যে রোগীকে দেখে লোকে ভয় পায়- রোগীকে পাপী বা অপরাধী বলে ঘৃণার চক্ষে দেখে।

কারণ: রক্তদুষ্টিই এই ব্যাধির মূল কারণ। রক্তে অম্লদোষ অত্যন্ত বেড়ে যাওয়ার ফলে যেখানে চামড়া অল্প সময়ের মধ্যে অধিক দুর্বল হয়ে পড়ে সেখানেই এই রোগটি ফুটে ওঠে। সাধারণতঃ দেখা যায় যে রোগীর যদি কোষ্ঠকাঠিন্য থাকে অথবা কোন ধারক ঔষধের সাহায্যে আমাশয় রোগের বিষ দেহের মধ্যেই নিবদ্ধ করে দেওয়া হয়, সেই সকল ক্ষেত্রেই রোগী পূর্বতন রোগের প্রতিক্রিয়া স্বরূপ এই রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়ে। তাই ইতোপূর্বে আমাশয় রোগ প্রসঙ্গে সূচিকা প্রয়োগে আমাশয় বন্ধ করবার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করতে বাধ্য হয়েছি।

চিকিৎসা:

প্রত্যূষে: উৎক্ষেপমুদ্রা, কর্মাসন, উড্ডয়ন, অগ্নিসার, দীর্ঘপ্রণাম, যোগমুদ্রা, ভুজঙ্গাসন, আগ্নেয়ী মুদ্রা বা আগ্নেয়ী প্রাণায়াম।

সন্ধ্যায়: সর্ব্বাঙ্গাসন, মৎস্যমুদ্রা, নৌকাসন, পশ্চিমোত্তানাসন, উড্ডয়ন, অগ্নিসার, মৎস্যেন্দ্রাসন।

আসনাদি অভ্যাসের পর দু'বেলাই শীতলী কুম্ভক করে রোগগ্রস্ত স্থানগুলি ভালভাবে মর্দন করে নিতে হবে।

পথ্য: যে সকল খাদ্য গ্রহণ করার ফলে কোষ্ঠকাঠিন্য রোগ দেখা

দিতে পারে সেগুলি কঠোর ভাবে বর্জন করে চলতে হবে; যে সকল খাদ্য পিত্ত বৃদ্ধি করে সেগুলিও বর্জন করতে হবে। মাছ, মাংস, ডিম, ঘি, অধিক পরিমাণে মশলা প্রভৃতি বস্তু যকৃৎকে দুর্বল করে দেয় ও তার ফলে কোষ্ঠকাঠিন্য রোগ সৃষ্ট হয় যা শ্বিত্র রোগের অন্যতম কারণ। এই ব্যাধিতে মৎস্য ও অন্যান্য আমিষ খাদ্য

অত্যন্ত কুপথ্য। তাই সেগুলি বিষবৎ পরিত্যজ্য। যে যত বেশী আমিষলোভীই হোক না কেন তাকে সে লোভ সংবরণ করতেই হবে।

রোগীর পক্ষে হেলেঞ্চা (হিংচা), গিমা, আমরুল, ব্রাহ্মী প্রভৃতি শাক অত্যন্ত হিতকর।

বিধি-নিষেধ: রোগটি আমাশয়েরই স্বগোত্র। তাই এতে মোটামুটি বিচারে আমাশয়েরই বিধি-নিষেধ মেনে চলা উচিত। রোগীর পক্ষে একটু একটু করে দিনে অনেক বার জল পান বিধেয় ও সমস্ত দিনে অন্ততঃ সাড়ে চার সের জল পান করা উচিত। রোগীর পক্ষে টক-মিষ্ট ফলের রস অত্যন্ত সুপথ্য। একাদশী, পূর্ণিমা ও অমাবস্যায় উপবাস বিধিও মেনে চলা অত্যন্ত বাঞ্ছনীয়। শীত ও গ্রীষ্ম ঋতুতে নির্দিষ্ট সময়ে এক টানা ১৫/২০ মিনিট আতপস্নান করে সর্বাঙ্গ ভিজে তোয়ালে দিয়ে মুছে নিতে হবে, আর এই ভাবে কয়েকবার আতপস্নান করে শেষের  বারে আর তোয়ালে দিয়ে গা না মুছে রোগগ্রস্ত জায়গা জলপাই তৈল, অভাবে মহুয়ার তৈল

দিয়ে মর্দন করে নিতে হবে। মনে রাখা দরকার, সূর্যালোক চর্মের সুস্থতা রক্ষার পক্ষে অত্যাবশ্যক ও এই জন্যে চর্মের, দুর্বলতা-সঞ্জাত সর্বপ্রকার ব্যাধিতেই আতপস্নান (রোদ লাগানো) অত্যন্ত হিতকর। ধৈর্যের সঙ্গে উল্লিখিত পদ্ধতিতে আসন ও বিধিব্যবস্থাগুলি মেনে চললে এই রোগে আরোগ্য লাভ করা মোটেই অসম্ভব নয়। যেহেতু এই রোগে তিনটি ধাতু বিকৃত হয় সেজন্যে রোগীর পক্ষে আহারে ব্যবহারে যথেষ্ট সংযম মেনে চলা দরকার। দিবানিদ্রা, রাত্রিজাগরণ, স্ত্রীসঙ্গ ও অতিভোজন বর্জন করা বাঞ্ছনীয়।

কয়েকটি ব্যবস্থা:

১) ছাগদুগ্ধের সঙ্গে আমড়ার ছালের রস মিশিয়ে প্রত্যহ প্রত্যুষে পান করলে,

অথবা

২) আমরুল শাকের রস চীনী সহ, অথবা

৩) পাকা কলা ঘিয়ে ভেজে এক চামচ পরিমাণ দুগ্ধক্ষীরার রসে মিশিয়ে প্রত্যহ সকালে খেলে এই রোগের হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায়।

৪) বুচকিদানা জলে বেটে রোগগ্রস্ত স্থানে প্রলেপ দিলে,

অথবা

৫) কালকেসেন্দার রসে গোরুর হাড় ঘষে রোগগ্রস্ত স্থানে প্রলেপ দিলে সুন্দর ফল পাওয়া যায়।

৬) এক আনা পরিমাণ শ্বেতজয়ন্তীর মূল গোদুগ্ধ সহ বেটে রবিবার দিন পান করলেও এই রোগ অত্যল্পকালের মধ্যেই বিদূরিত হয়।

সূচীপত্র

# সুপ্তিস্খলন

লক্ষণ : মাসে চার বারের অধিক সুপ্তিস্থলন, শুক্রতারল্য, নিদ্রাভঙ্গের পর শারীরিক দুর্বলতা বোধ- বিশেষ করে হাঁটুর দুর্বলতা, বয়সের অনুপাতে কন্ঠস্বর মোটা ও কর্কশ হয়ে যাওয়া বা ভেঙ্গে যাওয়া বা মধ্যে মধ্যে গাল-গলা ফোলা, একটুতেই সর্দি লাগা প্রভৃতি এই ব্যাধির লক্ষণ।

সাধারণতঃ দেহে উৎপন্ন শুক্রের কিছুটা অংশ উদ্বৃত্ত হ'য়ে পড়ে। এই উদ্বৃত্ত শুক্র অবিবাহিতদের পেশাবের সঙ্গে বা মাসে তিন-চার দিন শুক্রস্খলনের মাধ্যমে ও বিবাহিতদের সহবাসে দেহ থেকে নির্গত হ'য়ে যায়। এই অবস্থাটা শরীর বা মনের পক্ষে ক্ষতিকর নয়, কিন্তু এই শুক্র- ক্ষয় মাত্রা ছাড়িয়ে গেলে অথবা সুপ্তিস্থলন কালে কোন স্নায়রিক সুখৰোধ না থাকলে বা শুক্র জলবৎ তরল

হ'য়ে গেলে অথবা সুপ্তিস্থলনের পর নিদ্রাভঙ্গ না হ'লে বুঝতে হবে এটি রোগের আকার ধারণ করেছে।

কারণ: ব্যাধিটি সাধারণতঃ কৈশোর ও প্রথম যৌবনের ব্যাধি। এর কারণ নানাবিধ। যেমন- 1

১) অতিরিক্ত হস্তমৈথুনাদি কদভ্যাসের ফলে শুক্রের অতি ক্ষয় বা শুক্রতারল্য দেখা দিলে এই ব্যাধি ফুটে ওঠে।

২) জননেন্দ্রিয়কে অপরিচ্ছন্ন রাখার ফলে এক প্রকার কীট সৃষ্ট হ'য়ে এই ব্যাধি উৎপন্ন করে।

৩) যৌন বিষয়ে অজ্ঞতানিবন্ধন অথবা অন্য কোন কারণে স্বাস্থ্য বিধি যথাযথ ভাবে পালন না করলে,

অথবা

৪) অল্প বয়সে খেলাধূলা, আসন বা গৃহের বাহিরে প্রাকৃতিক পরিবেশগুলি বর্জন করে অতিরিক্ত পড়াশুণায় ব্যস্ত থাকলে,

অথবা

৫) কামোদ্দীপক সাহিত্যপাঠের ও চিত্রদর্শনের অভ্যাস থাকলে কিশোর ও তরুণদের স্নায়ুসমূহ উত্তেজিত হ'য়ে ওঠে ও তার ফলে এই রোগটি আত্মপ্রকাশ করে।

৬) চিন্তার ক্ষেত্রে সংযমের অভাব, ঈশ্বরনিষ্ঠার অভাব প্রভৃতির ফলে বৃত্তি অত্যধিক ভোগাভিমুখী হ'য়ে গেলে এই রোগটি উৎপন্ন হয়। ৭) অতিরিক্ত মশলাযুক্ত খাদ্য অথবা আমিষ খাদ্য অথবা

গুরুপাক খাদ্য বা বেশী রাত্রে ভোজনের ফলে পেট গরম হ'য়ে উঠলে

অথবা যকৃতের দোষে কোষ্ঠকাঠিন্য ব্যাধি দেখা দিলে দেহনিম্নস্থ শুক্র

ঊর্ধ্বগতি হ'তে সক্ষম হয় না। আর এ অবস্থায় তারা দেহ থেবে

নিঃসারিত হ'য়ে গিয়ে এই রোগ সৃষ্টি করে।

চিকিৎসা:

প্রাতে: উৎক্ষেপমুদ্রা, ময়ূরাসন, সর্ব্বাঙ্গাসন, মৎস্যমুদ্রা, নৌকাসন, পশ্চিমোত্তানাসন, আন্তসী মুদ্রা বা আন্তসী প্রাণায়াম।

সন্ধ্যায়: মৎস্যেন্দ্রাসন, অগ্নিসার, উড্ডয়ন, ৰন্ধত্রয়, গোমুখাসন ও : বজ্রাসন।

পথ্য: কোষ্ঠ পরিষ্কার থাকে এরূপ সমস্ত পুষ্টিকর খাদ্যই গ্রহণ করা যেতে পারে। রোগীর পক্ষে রাত্রে আমিষ ভক্ষণ বন্ধ রাখা উচিত

ও দিবাকালে আমিষের পরিমাণ কম করে দেওয়া উচিত। ফলমূল ও দুগ্ধ যথোপযুক্ত পরিমাণে ব্যবহার করা যেতে পারে। সব রকমের নেশার জিনিস পরিত্যাগ করা উচিত। লাউ, ছাঁচি কুমড়া, কলমী শাক, শাঁখালু এই রোগে সুপথ্য।

বিধি-নিষেধ: রোগীর পক্ষে মধ্যে মধ্যে ব্যাপক স্নান করা

বাঞ্ছনীয়। শরীর সুস্থ থাকলে প্রত্যহ অন্ততঃ দুই বার করে স্নান করা উচিত ও যথেষ্ট পরিমাণে (দৈনিক সাড়ে চার সের) জল পান করা উচিত। শারীরিক পরিশ্রমের মাত্রা বাড়িয়ে দেওয়া দরকার ও ভোরে আর সন্ধ্যায় অতি অবশ্য কিছুটা সময় খোলা হাওয়ায় বেড়ানো বা দৌড়ানো উচিত। লজ্জায় রোগের কথা চেপে যাওয়ার ফল অত্যন্ত ক্ষতিকর। তাই রোগের লক্ষণ প্রকাশ পাবার সঙ্গে সঙ্গে উপযুক্ত ব্যষ্টির পরামর্শ নিয়ে তদনুযায়ী চলা উচিত। একাদশী, পূর্ণিমা ও অমাবস্যায় উপবাস-বিধি প্রতিপালন করা দরকার ও যত দূর সম্ভব নিজেকে প্রাকৃতিক পরিবেশে রাখা দরকার। আহারে, ব্যবহারে ও জীবনের সর্ব ক্ষেত্রেই প্রকৃতিসম্মত

ব্যবস্থাগুলি প্রতিপালন করা উচিত। কৈশোর ও যৌবনের প্রারম্ভে শরীর ও মনের বিভিন্ন প্রয়োজন মেটাবার জন্যে প্রকৃতি যে সকল ব্যবস্থা অবলম্বন করে থাকে সেগুলি সম্বন্ধে যথাযথ জ্ঞান অর্জন করে নেওয়া বাঞ্ছনীয় কারণ তাতে করে মানুষ সহজেই রোগাক্রমণের বিরুদ্ধে নিজেকে তৈরী করে নিতে পারে। এই বয়সে প্রাণশক্তির দ্রুত বিকাশ নিবন্ধন শরীরের উত্তাপ রক্ষার ক্রমবর্ধমান প্রয়োজনে ও ঘর্ষণ-সম্ভাবনাযুক্ত সন্ধিস্থানগুলিতে চর্মের, সুস্থতা রক্ষার নিমিত্ত প্রকৃতি আবশ্যকমত কেশ, লোম উৎপন্ন করে দেয়। তাই অপ্রয়োজনীয় জ্ঞানে লোম নষ্ট করে দেওয়ার ফল শরীর ও মন দু'য়ের পক্ষেই ক্ষতিকর।

রাত্রের আহার সাড়ে আটটা/ন'টার মধ্যে সেরে ফেলা উচিত ও আহারের এক/দেড় ঘণ্টার মধ্যে শয়ন করা অনুচিত। আহারের পর বেশ কিছুটা সময় দক্ষিণ নাসা প্রবাহিত রাখা উচিত। মেয়েছেলেদের সঙ্গে বেশী মেলামেশা, নারীচিন্তা, কামোদ্দীপক ও অশ্লীল সাহিত্যপাঠ বা চিত্রদর্শন কঠোর ভাবে বর্জন করে চলতে হবে। পেশাবের পর জল ব্যবহার করা বাঞ্ছনীয় ও জননযন্ত্রের

আবরণীচর্ম সরিয়ে দিয়ে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা বাঞ্ছনীয়। স্নানকালে দেহের সন্ধিস্থানগুলিকে, বিশেষ করে বাহুমূল, উরুসন্ধি ভালভাবে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে নেওয়া উচিত। ভোজনের ও পাঠের পূর্বে ও পরে আর শয়নের পূর্বে অতি অবশ্য ব্যাপক শৌচক্রিয়া করে নেওয়া দরকার। মনে রাখা দরকার, ব্যাধিটি মোটেই উপেক্ষণীয় নয়, কারণ এর ফলে দেহের সার ধাতু শুক্র ব্যাপকভাবে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে যাওয়ায় দেহের সমস্ত যন্ত্রই দুর্বল হয়ে পড়ে। মস্তিষ্কের স্নায়ুকোষসমূহের পরিপোষক এই শুক্র। তাই এর অতি ক্ষয়ে মস্তিষ্ক দুর্বল হয়ে পড়ে, স্মরণশক্তি হ্রাসপ্রাপ্ত হয়, কৈশোরেই মানসিকতার বিচারে মানুষ বৃদ্ধ হয়ে পড়ে, কারণে অকারণে সর্বদা বুক ধড়ফড় করে, সাহস ও তেজস্বিতা নষ্ট হয়ে যায়।

কয়েকটি ব্যবস্থা:

১) এক ইঞ্চি পরিমাণ তুলসীর শিকড় পাণের মধ্যে ভরে উত্তম রূপে চর্বণ করে ভক্ষণ করলে ১০/১৫ দিনের মধ্যেই এই রোগ সেরে

যায়।

২) তুলসী পাতার রস এক তোলা খালি পেটে প্রত্যহ সকালে

১০/১৫ দিন পান করলে সুপ্তিস্থলন ব্যাধি দূরীভূত হয়।

৩) আহারান্তে মুখশুদ্ধি রূপে হরিতকীখণ্ড ব্যবহার অভ্যাস করলে এই রোগ থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায়।

# স্ত্রীব্যাধি

সূচীপত্র

## (ক) ঋতুরোগ:

লক্ষণ: সাধারণতঃ প্রতি চান্দ্র মাসে এক বার নারী দেহে ঋতুস্রাব

হয়ে থাকে। এর স্বাভাবিক ক্রম প্রতি চান্দ্র মাস অন্তর হলেও দৈহিক সুস্থতার তারতম্যভেদে কারও বা ২৯/৩০ দিন অন্তর, কারও বা ২৬/২৭ দিন অন্তরও হয়ে থাকে। ঋতুস্রাব সাধারণতঃ ৩ দিন থেকে ৫ দিন পর্যন্ত স্থায়ী হয়ে থাকে। ঋতুস্রাব যদি উপর্যুক্ত নির্দিষ্ট সময়ের হিসাব মেনে না চলে অর্থাৎ তার উদয় চান্দ্র মাসের হিসাবে না হয়, স্রাব একাদিক্রমে এক হপ্তা, দু'ইপ্তা হতে থাকে অথবা কখনও হয়, কখনও বা ৰন্ধ হয় অথবা কখনও অধিক হয়, কখনও বা অল্প হয় তখন সেই ব্যাধিকে বলা হয় 'অনিয়মিত ঋতু'।

সুস্থ অবস্থায় সাধারণতঃ এক পোয়া আন্দাজ আর্তব রস ঋতুকালে বহির্গত হয়। যদি কোন ক্ষেত্রে এর পরিমাণ উপরিউক্ত পরিমাণের চেয়ে অল্প হয় তখন সেই ব্যাধিকে বলা হয় 'অল্প রজঃ'। নির্দিষ্ট সময়ে ঋতুস্রাব না হ'লে বা কখনও কখনও

ক্রমান্বয়ে ২/৩ মাস বন্ধ থাকলে অথচ সেই নারী যদি সেই সময় অন্তঃসত্ত্বা না থাকে সেক্ষেত্রে, এই ব্যাধিকে বলা হয় 'ঋতুরোধ'।

কারণ: নারীর সন্তান-ধারণক্ষমতা উৎপন্ন হবার সময় থেকে ওই ক্ষমতা যতদিন ক্রিয়াশীল থাকে ততদিন অর্থাৎ গ্রীষ্মপ্রধান দেশে ১২/১৪ বৎসর বয়স থেকে ৪৫/৫৫ বৎসর বয়স পর্যন্ত ও শীতপ্রধান দেশে ১৪/১৬ বৎসর বয়স থেকে ৫০/৬০ বৎসর বয়স পর্যন্ত নির্দিষ্ট- সময়ে নির্দিষ্ট পরিমাণ আর্তব ক্ষরণই সুস্থতার লক্ষণ। সন্তানধারণক্ষমা নারীর জরায়ু তার ঝিল্লিতে প্রতি মাসে ভ্রূণের জন্যে প্রাথমিক আধার নির্মাণ করে। এই ভ্রূণ নির্মাণের কাজে দেহস্থ যৌবনরক্ষক প্রতিটি গ্রন্থি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সাহায্য করে। ভ্রূণের দেহ নির্মাণের জন্যে উপযুক্ত রক্তও গ্রন্থিসমূহের সহযোগিতায় জরায়ুতে প্রেরিত হতে থাকে। মাতৃবীজ ও পুংবীজের সহায়তায় যেক্ষেত্রে ভ্রূণ নির্মিত হবার সুযোগ পায় সেক্ষেত্রে ওই রক্ত ভ্রূণের দেহ তৈরীর কার্যে ব্যয়িত হয়। কিন্তু যে কারণেই হোক্, ভ্রূণ যদি উৎপন্ন না হয়, সেক্ষেত্রে আর্তবপূর্ণ উত্তেজিত জরায়ু সেই আধারটিকে ভেঙ্গে দেয়, জরায়ুর সঞ্চিত রক্ত শরীরের অন্য কাজে না লাগায় ভগ্ন আধার সহ তা'

দেহ থেকে বিনির্গত হয়ে যায়। এই অপ্রয়োজনীয় রক্তকে আর্তব বা রজঃ বলা হয়।

অতিরজঃ, অল্পরজঃ, অনিয়মিত ঋতু প্রভৃতি সর্ব প্রকার ঋতুরোগের প্রধান কারণ রক্তাল্পতা। নারীদেহে রক্তের অল্পতা ঘটলে যৌবনরক্ষক গ্রন্থিগুলিও দুর্বল হয়ে' পড়ে ও তাদের দ্বারা ভ্রূণের আধার নির্মাণের কার্য যথাযথভাবে সম্পাদিত হতে পারে না। রক্ত কম থাকায় ভ্রূণের দেহ নির্মাণের জন্যে উপযুক্ত পরিমাণ রক্ত জরায়ুতে সঞ্চিত হতে পারে না। এর ফলে 'অল্পরজঃ' রোগটির উদ্ভব হয়। রক্তের পরিমাণ খুব অল্প হলে অথবা দেহযন্ত্রের ত্রুটির ফলে (অতি কৃশ বা অতি স্থূল দুই প্রকারের নারীর মধ্যেই এই রক্তাল্পতা দেখা দিতে পারে) যে ক্ষেত্রে জরায়ুতে অল্প রক্ত সঞ্চিত হয় সেরূপ নারীর যদি বায়ুর ঊর্ধ্বগতির ভাব থাকে সে অবস্থায় ঋতুর প্রবাহ একেবারেই বন্ধ হযে যেতে পারে। এরই নাম ঋতুরোধ রোগ। সঞ্চিত ওই দূষিত রক্ত দেহে

বহু প্রকারের অনর্থ ঘটাবার সুযোগ পায় ও নারীর অকাল মৃত্যু ঘটে। এই শ্রেণীর দুর্বল নারীরা প্রায়ই যক্ষ্মা, হাঁপানি প্রভৃতি চির রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়ে। রজঃ রোধের ফলে হিষ্টিরিয়া বা সাময়িক উন্মাদনাও দেখা দিতে পারে। রোগের ফলে এদের মেজাজও তাই উগ্র ধরণের হয়ে যায়।

যকৃতের দুর্বলতা, কোষ্ঠকাঠিন্য বা অতিরিক্ত স্বামী সহবাসের ফলে অনিয়মিত ঋতুরোগটি সৃষ্ট হয়।

রক্তে অম্লাধিক্য ঘটলে, যকৃৎ ও রক্ত-পরিষ্কারক যন্ত্রগুলি দুর্বল হয়ে পড়লে দেহস্থ বিষও ব্যাপকভাবে আর্তব রসের সঙ্গে বহির্গত হয়। একেই বলা হয় অতিরজঃ।

চিকিৎসা:

প্রাতে: উৎক্ষেপ মুদ্রা, পদহস্তাসন, ৰন্ধত্রয়, আন্তসী মুদ্রা বা আন্তসী প্রাণায়াম।

সন্ধ্যায়: যোগমুদ্রা, দীর্ঘপ্রণাম, ভুজঙ্গাসন, কর্মাসন, কাকচঞ্চু মুদ্রা।

পথ্য: ঋতুকালে সহজপাচ্য অথচ পুষ্টিকর খাদ্যই গ্রহণ করা উচিত। সব রকম ফলের রস, দুধ, শাক-সব্জী ও তরিতরকারীর ঝোল এ অবস্থায় বেশ সুপথ্য। আমিষ খাদ্য, অতিরিক্ত ভাজা-পোড়া, অতিরিক্ত ঘি, তেল, মশলাযুক্ত খাদ্য বর্জনীয়। মশলার মধ্যে হিং ও লবঙ্গ বিশেষ উপকারী। তবে সেগুলিও অধিক পরিমাণে খাওয়া উচিত নয়।

বিধি-নিষেধ: ঋতুকালে দিবানিদ্রা, রাত্রি জাগরণ, শারীরিক

পরিশ্রম সর্বদা বর্জনীয়। সামনের দিকে ঝুঁকে ভারী জিনিস তোলা উচিত নয়; কারণ তার ফলে চাপ পড়ে রক্তপূর্ণ জরায়ুর স্থানচ্যুতি ঘটতে পারে। অগ্নিসেবনও নিষিদ্ধ কারণ অধিক ক্ষণ অগ্নির উত্তাপে থেকে নারীর দেহ-মন উত্তেজিত হয়ে যেতে পারে। তবে যাদের গৃহে রন্ধনকার্যের জন্যে দ্বিতীয় কেউ নেই তাদের

উচিত রান্না ঘরের বদ্ধ পরিবেশের মধ্যে না থেকে উন্মুক্ত পরিবেশে তোলা উনুনে রান্না করা আর নিজেকে যত দূর সম্ভব খাদ্যদ্রব্যাদি থেকে দূরে রাখা কারণ দেহনির্গত আর্তব রস বস্তুসমূহের সংস্পর্শে এসে গেলে খাদ্যবস্তুও দূষিত হয়ে যাবার সমূহ সম্ভাবনা। শরীরকে সম্পূর্ণভাবে উত্তেজনামুক্ত  রাখার জন্যে কোন প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষকে স্পর্শ করা অবিধেয়। দেহস্থ দূষিত স্রাবের প্রভাবে পতি-পুত্র-কন্যার স্বাস্থ্য যাতে খারাপ না হয় তার জন্য রজঃস্বলা নারীর কর্তব্য স্বতন্ত্র শয্যায় শয়ন করা! ওই শয্যা অবশ্যই শুষ্ক ও আরামপ্রদ হওয়া উচিত । ঋতুকালে নারীকে নৃত্য, গীত, শঙ্খধ্বনি প্রভৃতি পরিশ্রমের কাজ থেকে দূরে থাকতে হবে, আর শরীর ও মনের পক্ষে আরামদায়ক হাল্কা কাজকর্ম বা হাসি-গল্পের মধ্যে দিন অতিবাহিত করতে হবে। দিনে যতটা বেশী সময় সম্ভব আচার্যোক্ত পদ্ধতিতে নিজেকে ঈশ্বর-প্রণিধানে রত রাখবার চেষ্টা করবে।

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে উল্লিখিত বিধি-নিষেধগুলি না মানার ফলে ঋতুরোগের প্রকোপ বেড়ে চলেছে।

ঋতুকালে স্নান নিষিদ্ধ নয়, তবে অতি শীতল জল বর্জনীয়। ঋতুর প্রথম দিনে সাধারণ জলেই স্নান করা যেতে পারে যদি তা' কষ্টদায়ক না হয়। দ্বিতীয় ও তৃতীয় দিনে সূর্যপক্ক ঈষদুষ্ণ জলে স্নান করা বিধেয়। রজঃস্বলা নারীর পক্ষে তুলা বা বস্ত্রখণ্ডের দ্বারা জননযন্ত্রের গতিপথ রুদ্ধ করে রাখা স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর। তৎপরিবর্তে বরং কৌপীন বা তুলার প্যাডের উপর জাঙ্গিয়া পরিধান করা উচিত।

যাদের যকৃৎ ভাল সেরূপ নারী ঋতুকালে গরম ভাতের সঙ্গে ঘি বা মাখন ব্যবহার করতে পারে। ঋতুমতী নারী প্রত্যহ যথেষ্ট পরিমাণে, আন্দাজ ৪/৫ সের জল পান করবে, অবশ্য এক সঙ্গে অধিক পরিমাণে নয়। যারা অতিরজঃ ব্যাধিতে ভোগে, তাদের উচিত অতিরিক্ত রক্তক্ষরণের সময় বিছানায় পায়ে'র দিকটা উঁচু ও মাথার দিকটা কিছুটা নীচু করে শুয়ে থাকা।

কয়েকটি ব্যবস্থা:

১) অতিরিক্ত রক্তপাতের ফলে রোগিণী দুর্বল হয়ে পড়লে দু'তোলা কুষ্মীমার রস বা দুর্বার রস কিঞ্চিৎ মধু সহ ঋতুকালে প্রত্যহ একবার সেব্য।

২) ৩/৪ টা ডালিম ফুল কাঁচা দুধে বেটে ঋতুকালে প্রত্যহ দিনে দু'বার করে সেব্য।

৩) কাঁটানটের মূল মধু সহ,

অথবা

৪) বাসক পাতার রস চীনী সহ প্রত্যহ ঋতুকালে সেব্য।

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *

সূচীপত্র

# (খ) বাধক

লক্ষণ : ঋতুস্রাবের পূর্বে তলপেটে অসহ্য যন্ত্রণা আর ঋতু পরিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে সেই যন্ত্রণা ধীরে ধীরে কমে যাওয়া ও তৎসহ ঋতুরও কম-বেশী অনিয়ম এই ব্যাধির প্রধান লক্ষণ।

কারণ: যে সকল নারী শারীরিক পরিশ্রম করে না, সাধারণতঃ

ধনী বা উচ্চ মধ্যবিত্ত কুলে যাদের জন্ম, তাদেরই এই ব্যাধিতে আক্রান্ত হ'তে দেখা যায়। শারীরিক পরিশ্রম না করার ফলে (কোন কোন ক্ষেত্রে শারীরিক দুর্বলতার জন্যে) জরায়ু ও ডিম্বকোষ দুর্বল হয়ে যায় আর এই দুর্বল দেহাংশ ঋতুকালে রক্তের চাপ ঠিক ভাবে সহ্য করতে পারে না। জরায়ুতে রক্ত নামবার সঙ্গে সঙ্গে জরায়ু ও ডিম্বকোষে যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় তা-ই তলপেটে বেদনা রূপে প্রকাশ পায়।

যে সমস্ত নারী যথোপযুক্ত শারীরিক পরিশ্রম করে তাদের মধ্যে এই ব্যাধি ক্বচিৎ পরিদৃষ্ট হয়। শারীরিক পরিশ্রমের অভাবের সঙ্গে যদি মানসিক অশান্তিও জড়িত থাকে তা'হলে এই ব্যাধি অধিকতর উগ্র রূপ ধারণ করে। উচ্চ শ্রেণীর সমাজে বিভিন্ন ধরণের সামাজিক বিধি- নিষেধের ফলে যাদের অতৃপ্ত যৌনজীবন যাপন করতে হয় তাদের মধ্যেই এই রোগ দেখা দেয়। এই বাধক রোগ নারীর বন্ধ্যাত্বের অন্যতম কারণ।

চিকিৎসা : ঋতুরোগের অনুরূপ।

পথ্য: খাদ্য যাতে ক্ষারধর্মী হয় সেদিকে বিশেষ নজর রাখতে হৰে। সব রকমের ফলমূল ও তরিতরকারীর ঝোল এই রোগের সুপথ্য। সব রকমের ভাজা, পোড়া, আমিষ, অতিরিক্ত ঘি, তেল, রসুন, পেঁয়াজ ও অতিরিক্ত মশলাযুক্ত খাদ্য এই রোগে বর্জনীয়। ৰাধক রোগগ্রস্তা নারীর পক্ষে রোগ সারবার পরেও অন্ততঃ চার মাস স্বামীসঙ্গ বর্জনীয়।

বিধি-নিষেধ: রোগ যন্ত্রণার সময় তলপেটে গরম সেঁক দেওয়া উচিত ও ঋতুকালে দুগ্ধ ও তরল পদার্থ বাদে রোগিণীর অন্য কোন কিছুই গ্রহণ করা উচিত নয়।

কয়েকটি ব্যবস্থা:

১) ১০/১২টি বোঁটা-ছাড়ানো অশোক ফুল আধ সের দুধ ও চার সের জলের সঙ্গে জ্বাল দিয়ে দেড় পোয়া থাকতে নাৰিয়ে তিন দিন সেব্য। এরই নাম অশোকক্ষীর।

২) চারা বেলের শিকড় কোমরে বেঁধে রাখলেও বাধকের যন্ত্রণা শান্ত হয়।

৩) ঘোড়ানিম গাছের শিকড়ের ছাল ৩/৪ তোলা পরিমাণ নিয়ে জলে সিদ্ধ করে ঋতুকালে প্রত্যহ সকাল বেলা সেবন করলে ঋতু পরিষ্কার হয়।

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *

সূচীপত্র

# (গ) প্রদর

লক্ষণ: কারণে, অকারণে বা অনুত্তেজনাতেও স্রাব নির্গত হওয়া প্রদরের লক্ষণ। এই রোগে স্রাব যদি হলদে রঙের অথবা লালচে,

কাল্লে বা যুক্ত অথবা মাংস-ধোয়া জলের মত হয় তাকে বলা হয় রক্তপ্রদর, আর স্রাব যদি শাদা রঙের হয় তাকে বলা হয় শ্বেতপ্রদর। নারীদের মধ্যে শ্বেতপ্রদর রোগের সংখ্যাই বেশী।

কারণ: প্রদরের কয়েকটিই কারণ রয়েছে। যেমন-

১) গর্ভপাত

২) কোষ্ঠকাঠিন্য

৩) অতিরিক্ত ঔষধ বা ইনজেকসন ব্যবহার

৪) অতিরিক্ত স্বামী সহবাস

৫) রক্তাল্পতা

যে কোন কারণে দেহে রক্তাল্পতা ঘটলে জরায়ুতে দেহযন্ত্র যথেষ্ট পরিমাণে রক্ত প্রেরণ করতে পারে না। সে ক্ষেত্রে ওই অল্প পরিমাণ রক্ত দেহস্থ অন্যান্য রসের সঙ্গে মিলিত হ'য়ে শাদাটে রঙের স্রাব রূপে বহির্গত হয় অর্থাৎ শ্বেতপ্রদর রোগ সৃষ্ট হয়।

গর্ভপাতের ফলেও নারীর দেহে রক্তের অভাব ঘটায় প্রদর রোগ সৃষ্ট হয়। অনুরূপ ভাবে অতিরিক্ত ঔষধ বা ইজেকসন ব্যবহারের ফলেও দুর্বল হ'য়ে যায় ও রোগটি ফুটে উঠে।

অতিরিক্ত স্বামী সহবাসের ফলে নারীদের কোষ্ঠকাঠিন্য হয় ও তার ফলে রক্ত বিকৃত হয় আর দেহে অম্লাধিক্য ঘটে ও প্রদর রোগ দেখা দেয়। কুমারী নারীদেরও অস্বাভাবিক উপায়ে স্বয়ংরতির ফলে একই ধরণের প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে ও তাদেরও এই রোগ হতে পারে।

যকৃৎ বেশী দুর্বল হয়ে পড়লে ও তৎসহ অগ্ন্যাশয়ের দুর্বলতা দেখা দিলে রক্তে অম্লভাগ বৃদ্ধি পায় ও সাধারণতঃ এই সকল ক্ষেত্রে রক্তপ্রদর রোগটি আত্মপ্রকাশ করে। শ্বেতপ্রদরের ন্যায় রক্তপ্রদর রোগটিতে রোগিণীর দেহে রক্তাল্পতার দোষ নাও থাকতে পারে। কিন্তু তার রক্ত অধিকতর দোষদুষ্ট হয়ে থাকে।

জননেন্দ্রিয়ের অভ্যন্তর ভাগ অপরিচ্ছন্ন রাখা ও যৌন ব্যাপারে অজ্ঞতার ফলে অপ্রাপ্তবয়স্কা বালিকা অথবা অবিবাহিতা নারীদের মধ্যে এক শ্রেণীর স্রাবরোগ দেখা দেয়। এটিকে প্রদর রোগ না বলে সাধারণ স্রাব বলাই অধিকতর সঙ্গত। তবে

যথাসময়ে যত্ন না নিলে পরবর্তীকালে এটা দুরারোগ্য প্রদরের রূপ নিতে পারে।

চিকিৎসা:

বালিকাদের স্রাব রোগে

প্রত্যুষে: উৎক্ষেপমুদ্রা, কর্মাসন, ৰন্ধত্রয় যোগ, আন্তসী মুদ্রা বা আন্তসী প্রাণায়াম।

সন্ধ্যায়: যোগমুদ্রা, দীর্ঘপ্রণাম, ভুজঙ্গাসন, কর্মাসন ও কাকচঞ্চু মুদ্রা।

প্রদররোগে চিকিৎসা:

প্রত্যূষে: উৎক্ষেপমুদ্রা, কর্মাসন, গোমুখাসন, যোগমুদ্রা, দীর্ঘপ্রণাম, ভুজঙ্গাসন, আন্তসী মুদ্রা বা আন্তসী প্রাণায়াম, অগ্নিসার ও উপবিষ্ট উড্ডয়ন।

সন্ধ্যায়: কর্মাসন, গোমুখাসন, যোগমুদ্রা, দীর্ঘপ্রণাম, ভুজঙ্গাসন, উপবিষ্ট উড্ডয়ন ও কাকচঞ্চু মুদ্রা।

সর্বপ্রকার ঋতুরোগে-বাধক, প্রদর বা অন্য যে কোন স্ত্রীব্যাধিই হোক না কেন, ঋতুকালে নারী আসন-মুদ্রাদির অভ্যাস করবে না, কেবল প্রাণায়াম করবে।

পথ্য: এই রোগের পথ্য ব্যবস্থা ঋতুরোগের ব্যবস্থার অনুরূপ।

বিধি-নিষেধঃ প্রদর রোগের বহুবিধ কারণ থাকলেও যৌন জীবনে

অসংযমই প্রধান কারণ। তাই আরোগ্যের ইচ্ছা থাকলে স্বামী-স্ত্রী উভয়কেই সংযত ভাবে চলতে হবে। শ্বেতপ্রদর রোগের মূল কারণ রক্তাল্পতা। তাই রোগিণী যাতে সহজপাচ্য পুষ্টিকর খাদ্য পায় সেদিকে বিশেষ নজর রাখতে হবে। রোগিণীর যদি দুধ সহ্য না হয় সেক্ষেত্রে ঘোল বা নারকেলের দুধ পান করা বিধেয়। বালিকাদের স্রাব রোগে যথাবিধি আসন, মুদ্রা অভ্যাসের সঙ্গে সঙ্গে শারীরিক পরিচ্ছন্নতার দিকেও নজর রাখতে হবে। জননেন্দ্রিয়ের অভ্যন্তরে দূষিত বস্তু জমবার সুযোগ পেলে স্রাব রোগ দেখা দেয়। তাই পুরুষ, নারী উভয়েরই পেশাবের পর জল ব্যবহার করা উচিত। যে সকল বালিকা এই রোগগ্রস্ত তাদের উচিত প্রত্যহ সাৰান জলে বা নিমপাতা-সিদ্ধ জলে শরীরের অভ্যন্তর ভাগ পরিষ্কার করে নেওয়া। আঙ্গুলের নখ ছোট করে কাটা উচিত। অন্যথায় দেহাভ্যন্তরে ক্ষতি হবার সম্ভাবনা থাকে।

অবিবাহিতা নারীদের স্বয়ংরতির অভ্যাসও কঠোর ভাবে বর্জনীয়।

কয়েকটি ব্যবস্থা:

১) আমানির সঙ্গে লাল জবা (চারটে) বেটে আধ তোলা পরিমাণ ঋতুকালে প্রত্যহ পান করলে সমস্ত ঋতু রোগে ভাল ফল পাওয়া যায়।

২) অশোকক্ষীর সমস্ত ঋতুরোগে ভাল ফল দেয়।

৩) রবিবার শ্বেত আকন্দের মূল কৃষ্ণ গবীর কাঁচা দুধের সঙ্গে বেটে চার আনা মাত্রা ঋতুকালে প্রত্যহ পান করলে ভাল ফল পাওয়া যায়।

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *

সূচীপত্র

# (ঘ) জরায়ুর স্থানচ্যুতি

লক্ষণ: তলপেটে ভার বোধ হওয়া, মল-মূত্র ত্যাগে অসুবিধা, রক্তাল্পতা, শ্বেতপ্রদর, পিঠে কোমরে ব্যথা, বাধক বেদনার মত বেদনা প্রভৃতি এই রোগের লক্ষণ।

কারণ: জরায়ু নাভিদেশের কতকগুলি স্নায়ুরজ্জুর সাহায্যে কতকটা ঝোলানো অবস্থায় থাকে। তাই কিছুটা স্থান পরিবর্তন বা পার্শ্ব- পরিবর্তন হওয়া জরায়ুর পক্ষে মোটেই অস্বাভাবিক নয়। মলনালী ও মূত্রনালীর মধ্যবর্তী স্থানে এর অবস্থিতি বলে এর স্থানচ্যুতির ফলে মলপ্রবাহ বা মূত্রপ্রবাহ বাধাপ্রাপ্ত হ'তে দেখা যায়। জরায়ু হ্রাস- বৃদ্ধিগুণসম্পন্ন। তাই জরায়ুর অবস্থাগত পরিবর্তনের ফলে দেহের নিম্নাংশে অনেক সময় বড় রকমের বিপর্যয় দেখা দেয়।

কোষ্ঠকাঠিন্য এই ব্যাধির একমাত্র কারণ না হ'লেও প্রধান কারণ, কেননা এর ফলে মলনালী সঞ্চিত মলে ফুলে ওঠে ও তার চাপে

জরায়ু স্থানচ্যুত হয়ে যায়। আবার এই কোষ্ঠকাঠিন্যের যতগুলি কারণ আছে তার মধ্যে অত্যধিক স্বামী-সহবাস অন্যতম কারণ।

ঋতুকালে যখন জরায়ু রক্তপূর্ণ থাকে সেই সময় সামনে ঝুঁকে কোন ভারী কাজ করলে বা উনুন থেকে ভারী হাঁড়ি, ডেচি নামাবার ফলেও জরায়ুর স্থানচ্যুতি ঘটতে পারে।

অতিরিক্ত স্বামী-সহবাসের ফলে দেহের নিম্নাংশের স্নায়ুসমূহ দুর্বল হয়ে পড়ে ও তার ফলে জরায়ুর ধারক স্নায়ুরজ্জুসমূহও দুর্বল হয়ে গিয়ে জরায়ুর স্থানচ্যুতিতে সাহায্য করে।

অতিরিক্ত ঔষধ বা ইন্জেকসন ব্যবহারের ফলে রক্ত তথা স্নায়ুপুঞ্জ দুর্বল হয়ে গিয়ে জরায়ুর স্থানচ্যুতি ঘটতে পারে আর ঠিক এই কারণে রক্তহীনতা বা স্নায়বিক দৌর্বল্যও এই রোগের অন্যতম কারণ।

গর্ভিণীর স্বাভাবিক প্রসবিনী শক্তির সাহায্য না নিয়ে চিকিৎসকের সাহায্যে বার বার প্রসব করানো হলেও অধোদেশের স্নায়ুপুঞ্জ দুর্বল হয়ে যায় ও তার ফলে জরায়ুর স্থানচ্যুতির সম্ভাবনা বেড়ে যায়।

চিকিৎসা:

প্রত্যূষে: উৎক্ষেপমুদ্রা, পদহস্তাসন, শলভাসন, উড্ডয়ন, ৰন্ধত্রয় যোগ, আন্তসী মুদ্রা বা আন্তসী প্রাণায়াম।

সন্ধ্যায়: পদহস্তাসন, পশ্চিমোত্তানাসন, সর্বাঙ্গাসন, মৎস্যমুদ্রা ও কাকচঞ্চু মুদ্রা।

এই রোগে ব্যাপক স্নান বেশ উপকারী।

পথ্য: ঋতুরোগের অনুরূপ।

বিধি-নিষেধ: এই রোগে রোগিণীকে যত দূর সম্ভব বিশ্রাম দেওয়া উচিত। স্বামী-সহবাস সম্পূর্ণ বন্ধ রাখা দরকার।

যদি জরায়ু একেবারেই নেমে আসে, তাতে অত্যধিক প্রদাহ হয় অথবা জরায়ুর মধ্যে বা তলপেটে আৰ (tumer) হওয়ায় জরায়ুর স্থানচ্যুতি ঘটে, সেক্ষেত্রে উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করলে ফল পাওয়া যায়।

কেউ কেউ রোগের এই রকমের অবস্থায় জরায়ু বা মাতৃগ্রন্থিতে শল্য চিকিৎসা করেন। বলা বাহুল্য মাত্র, এতে রোগের প্রতিকার তো হয়ই না, বরং জিনিসটা হয়ে দাঁড়ায় মাথার যন্ত্রণায় মাথা কেটে ফেলার মত। এই গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থিগুলির অভাবে নারী নপুংসকে পরিণত হয়ে যায় ও তার শরীরে মনে বড় রকমের পরিবর্তন আসে। নানান ধরণের মানসিক ব্যাধি প্রকট হতে থাকে। এইরূপ নারীকে অনেক সময় উন্মাদ হতেও দেখা যায়। জরায়ুর স্থানচ্যুতি বুঝতে পারার সঙ্গে সঙ্গে কোষ্ঠ যাতে পরিষ্কার থাকে ও মূত্র যাতে স্বাভাবিক থাকে সেদিকে সৰ সময় বিশেষ দৃষ্টি রেখে চলতে হবে।

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *

সূচীপত্র

# (ঙ) বন্ধ্যাত্ব

লক্ষণ: ১৬/১৭ বৎসর থেকে ৩০/৩৫ বৎসর বয়সের মধ্যে স্বামীসঙ্গ সত্ত্বেও নারীর যদি সন্তান-সম্ভাবনা দেখা না দেয়, সেক্ষেত্রে তাকে বন্ধ্যা বলা হয়। এই সকল ক্ষেত্রে কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে নারীর বন্ধ্যাত্ব দোষ থাকতেও পারে, নাও থাকতে পারে, অথচ পুরুষের ক্লীবতার জন্যে অনেক সময় নারীকে সমাজে বন্ধ্যা রূপে পরিচিতা হতে হয়।

**কারণঃ** বন্ধ্যাত্বের কারণ নানাবিধ; যেমন-

১) মাতৃগ্রন্থিতে উৎপন্ন ডিম্ব যে ডিম্ববহা নাড়ীর মধ্য দিয়ে সন্তানৰীজকে জরায়ুতে প্রেরণ করে সেই নাড়ী দুর্বল, রোগগ্রস্ত বা দূষিত বস্তুপূর্ণ হয়ে থাকলে সন্তানৰীজ যথাযথ ভাবে জরায়ুতে

পৌঁছাতে পারে না বা পথিমধ্যেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। সুতরাং জরায়ুতে জীবিত- স্ত্রীৰীজের অভাৰ থাকায় পুংৰীজের সান্নিধ্য সত্ত্বেও ভ্রূণ উৎপন্ন হ'তে

পারে না। ২) উরুসন্ধির দুই দিকে অবস্থিত মাতৃগ্রন্থি স্ত্রীৰীজ নির্মাণের যন্ত্র। উপযুক্ত শারীরিক পরিশ্রমের অভাবে, রক্তাল্পতায়, দৈহিক দুর্বলতায় বা অন্য কোন প্রকার দৈহিক ত্রুটির ফলে অথবা জন্মগত ভাবে মাতৃগ্রন্থির ত্রুটি থাকলে স্ত্রীৰীজ নির্মিত হতে পারে না, অথবা নির্মিত হলেও তা' অত্যন্ত দুর্বল হয়। তাই এই শ্রেণীর নারীরা বন্ধ্যা অথবা মৃতবৎসা হয়ে থাকে।

৩) যে সকল নারী অত্যন্ত ক্রুদ্ধস্বভাবা অর্থাৎ বায়ু ও পিত্তপ্রধানা তাদের দেহস্থ পিত্ত কিছু পরিমাণে জরায়ুতে এসেও সঞ্চিত হয়। এই পিত্তবিষ পুংৰীজকে ধ্বংস করে দেয় আর তাই ভ্রূণ সৃষ্টির সম্ভাবনা নষ্ট হয়ে যায়।

৪) দেহে মেদের পরিমাণ বেশী থাকলে অনেক ক্ষেত্রে নারীর জননেন্দ্রিয়ের আকৃতি-প্রকৃতি অস্বাভাবিক ও কিছুটা বিকৃত হয়ে যায় আর তার ফলে পুংবীজ যথাস্থানে পৌঁছাতে না পারায় ভ্রূণ সৃষ্টি হতে পারে না। এই শ্রেণীর নারী স্বামীসঙ্গকালে অত্যন্ত ক্লেশ অনুভব করে। বৃত্তিগত অতৃপ্তির জন্যে এরা প্রায়ই অতি মাত্রায় কামুকী হয়, সর্বদা কলহ করে সংসারের শান্তি নষ্ট করে।

৫) অতিরিক্ত স্বামীসঙ্গের ফলে নিম্নাঙ্গের স্নায়ু ও গ্রন্থিসমূহ দুর্বল ও অসাড় হয়ে যায় আর এই রূপ ক্ষেত্রে ভ্রূণসৃষ্টির কোন সম্ভাবনাই থাকে না। ঠিক এই কারণে বারবণিতারা সাধারণতঃ বন্ধ্যা হয়ে থাকে।

৬) দেহস্থ অম্লবিষ অনেক সময় উৎপন্ন ভ্রূণকে প্রাণরস তথা রক্ত যোগান দিতে দেয় না। তার ফলে অকালে ভ্রূণ নষ্ট হয়ে যায়, নারীর মৃতবৎসা দোষ দেখা দেয়। যারা অত্যধিক আমিষপ্রিয় অথচ শারীরিক পরিশ্রম করে না তাদের রক্তে অম্লবিষের আধিক্য পরিদৃষ্ট হয়।

৭) যে সকল পুরুষ ২৫/২৬ বৎসর বয়সের পূর্বে অস্বাভাবিক

উপায়ে অতিরিক্ত পরিমাণে শুক্র নষ্ট করে থাকে তাদের সুস্থ পুংৰীজ উৎপাদনের সামর্থ্য নষ্ট হয়ে যায়। তাদের পুংৰীজ ভ্রূণ সৃষ্টি করতে পারে না।

৮) প্রাপ্তবয়স্ক হ'বার পরেও যে সকল পুরুষ অসংযমী তাদের পিতৃগ্রন্থি (মুল্ক) সুস্থ পুংৰীজ উৎপন্ন করতে পারে না। সুতরাং তাদের ক্ষেত্রেও ভ্রূণ উৎপন্ন হয় না।

৯) পুরুষের শরীরে পিত্তবিষ অধিক পরিমাণে থাকলে সেই পিত্তবিষ জরায়ুস্থ স্ত্রীবীজকে ধ্বংস করে দেয়, সুতরাং ভ্রূণ উৎপন্ন হতে পারে না।

১০) শুক্রৰহা নাড়ী রোগগ্রস্ত, দুর্বল, অতি কঠিন বা দূষিত বস্তুপূর্ণ হয়ে থাকলে পুরুষের ক্লীবত্ব দেখা দেয়। সুতরাং ওই সকল ক্ষেত্রেও ভ্রূণোৎপত্তির সম্ভাবনা থাকে না।

চিকিৎসা : এই রোগের কারণ বহুবিধ। সুতরাং কোন একটি বিশেষ পদ্ধতি সকলের উপর প্রযোজ্য নয়। নারী বা পুরুষের যে ত্রুটির ফলে যে ক্ষেত্রে বন্ধ্যাত্ব রোগ দেখা দিয়েছে সেই ত্রুটি বা ত্রুটিসমূহ দূর করবার উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করলে সুফল পাওয়া যাবে। আর ঠিক একই ভাবে কাকবন্ধ্যা রোগের চিকিৎসা করতে হবে।

অনেকের ধারণা প্রদর রোগের ফলে বা জরায়ুর স্থানচ্যুতির ফলে বন্ধ্যাত্ব রোগ দেখা দেয়। কিন্তু এ ধারণা ষোল আনা সত্য নয় কারণ, ওই রোগগুলির সময়ও মাতৃগ্রন্থি ও জরায়ুর মধ্যে ডিম্ববহা নাড়ীর  মাধ্যমে সম্পর্ক যথাযথ ভাবে রক্ষিত হয়ে থাকে। তবে হ্যাঁ, ওই রোগগুলি থাকলে নারীর মৃতবৎসা হওয়ার সম্ভাবনাই সমধিক।

জন্মগত কারণে যে সকল পুরুষের পিতৃগ্রন্থি ও নারীর মাতৃগ্রন্থি অবিকশিত, তাদের ক্লীবত্ব বা বন্ধ্যাত্ব দূর হওয়া দুরূহ ব্যাপার।

অনেক সময় নারীর জননেন্দ্রিয়ের দ্বার শিথিল বা প্রসারিত হয়ে যায় ও নাড়ীও বেরিয়ে আসার উপক্রম হয়। সেরূপ ক্ষেত্রে ব্যাপক স্নান ও তৎসহ উৎক্ষেপমুদ্রা, যোগমুদ্রা, দীর্ঘপ্রণাম ও ভুজঙ্গাসন অভ্যাস করলে ও নিয়মিত ব্যাপক স্নান করলে অত্যল্প কালের মধ্যে সুফল পাওয়া যায়। অবশ্য বন্ধ্যাত্বের কারণ যাই হোক না কেন, এই রোগে ব্যাপক স্নান অত্যন্ত উপকারী।

পথ্য: পথ্য ও বিধি-নিষেধ অন্যান্য ঋতুরোগের অনুরূপ।

কয়েকটি ব্যবস্থা:

১) গর্ভিণীর কটিদেশে শ্বেত অপামার্গের মূল (সম্পূর্ণ মূলটা) ধারণ করলে অথবা শ্বেত অপরাজিতার মূল ধারণ করলে গর্ভপাত বিদূরিত হয়।

উপসংহার: আজকাল নারী সমাজের এক বৃহৎ অংশ কোন না কোন স্ত্রীব্যাধিতে ভুগে চলেছে। এর প্রধান কারণগুলি নিম্নরূপ:

১) পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব ও তজ্জনিত রক্তাল্পতা
২) অপ্রাকৃতিক জীবনযাত্রা
৩) ঋতুকালে বিধি-নিষেধ যথাযথ ভাবে মেনে না চলা
৪) স্ত্রী ও পুরুষের অসংযম
৫) যৌন ব্যাপারের অজ্ঞতা

স্ত্রীব্যাধি আপাতঃদৃষ্টিতে প্রাণঘাতক না হ'লেও এর ফলে ধীরে ধীরে জীবনীশক্তি ধ্বংস হয়ে যায় ও সমাজের যারা আশা-ভরসা সেই শিশুরা পঙ্গু দেহ নিয়ে জন্মায় ও পরবর্তী কালেও তাদের দৈহিক ও  মানসিক কোন না কোন ত্রুটি থেকেই যায়। সমাজের

পক্ষে এ অবস্থাটা যে কতখানি ভয়াবহ তা সহজেই অনুমেয়। স্ত্রীব্যাধির ফলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে নারীর অকাল মৃত্যু হয়। সর্ব ক্ষেত্রে না হোক, অনেক ক্ষেত্রে পুরুষের অসংযম স্ত্রীব্যাধির অন্যতম কারণ। পুরুষের অসংযমের ফলে নারীজাতি অকালে শ্মশানযাত্রিণী হোক -এ অবস্থাটা নিশ্চয়ই বাঞ্ছনীয় নয়। অসংযম পুরুষের পক্ষেও ক্ষতিকর, কারণ এতে মস্তিষ্কের পরিপোষক শুক্র ধাতু ব্যাপকভাবে অপচিত হয়। মনে রাখা উচিত জীবনে সংযমের স্থান সর্বোচ্চ।

সূচীপত্র

# স্থূলতা

লক্ষণ : মানুষের শরীরের পক্ষে মেদ একটি অত্যাবশ্যক ধাতু। মেদ না থাকলে অস্থি ও মাংসের স্বাভাবিক ক্রিয়াশীলতা এক

মুহূর্ত অব্যাহত থাকতে পারে না। কিন্তু এই মেদ যখন প্রয়োজনের মাত্রা ছাড়িয়ে বৃদ্ধি পায়, তখন তার ফলে সমস্ত শরীর যন্ত্রই অপটু হয়ে পড়ে। অবস্থার নাম মেদবৃদ্ধি বা স্থূলতা।

কারণ: শারীরিক পরিশ্রমের অভাব ও তৎসহ দধি, দুগ্ধ, মাখনাদি পুষ্টিকর খাদ্যের প্রাচুর্য, মিষ্ট খাদ্যের প্রাচুর্য্য, অধিক পরিমাণে শ্লেষ্মাবর্ধক খাদ্যের (মৎস্য, তেঁতুল প্রভৃতি) ব্যবহার প্রভৃতি এই রোগের প্রধান কারণ। বিশেষ করে উপরিউক্ত কারণগুলির সঙ্গে ব্যষ্টিবিশেষের মানসিক পরিশ্রমের আধিক্য থাকলে রোগী অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্থূলকায় হয়ে পড়ে।

আমিষ খাদ্য, পুষ্টিকর খাদ্য ও ঘৃত-দুগ্ধাদির প্রয়োজন যারা শারীরিক পরিশ্রম করে তাদের পক্ষেই বেশী। কি মানসিক পরিশ্রম বেশী করে কিন্তু শারীরিক পরিশ্রম কম করে তাদের পক্ষে আমিষ, শর্করা জাতীয় ও চর্বি জাতীয় খাদ্যের প্রয়োজন অল্প কিন্তু ভোগী মানুষ রসনার তৃপ্তির জন্যে যে খাদ্য তার পক্ষে অপ্রয়োজনীয় বা অল্প- প্রয়োজনীয় সেগুলিও অধিক পরিমাণে ব্যবহার করে। আজকের পৃথিবীতে মানুষের অধিকাংশ সম্পদ

অল্পসংখ্যক পরিশ্রমবিমুখ বুদ্ধিজীবীর কুক্ষিগত। তাই আমিষ, ঘৃত, মাখন, মিষ্টান্ন প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত মহার্ঘ খাদ্যবস্তুসমূহ তারাই ক্রয় করতে পারে ও রসনার তৃপ্তির জন্যে তারাই সেগুলি ব্যবহার করে। এর ফলে একদিকে যেমন

অপ্রয়োজনীয় মেদে তাদের শরীর স্ফীত হয়ে ওঠে অন্য দিকে তেমনি

নিঃস্ব হৃতসর্বস্ব পরিশ্রমী মানুষেরা তাদের শরীর রক্ষার পক্ষে প্রয়োজনীয় ঘৃত, মাখন, মিষ্টান্নাদি থেকে বঞ্চিত হয় ও শরীরের ক্ষয়- ক্ষতি যথোপযুক্ত ভাবে পূরণ না হওয়ায় দুর্বল, কৃশকায়, ভগ্নস্বাস্থ্য হয়ে পড়ে। পুষ্টির অভাবে ও অতি পরিশ্রমে তাদের মধ্যে যক্ষ্মা রোগ দেখা দেয়। মনে রাখা দরকার গ্রীষ্মপ্রধান দেশের পক্ষে আমিষ খাদ্য বিষবৎ। তবু যারা অতিরিক্ত শারীরিক পরিশ্রম করে তারা যদি অল্প পরিমাণ আমিষ খাদ্য গ্রহণ করে সেটা তাদের শরীরের পক্ষে ক্ষতিকর তো হয়ই

না, মনের উপরও তার ক্ষতিকর প্রভাব পড়ে না।

তাই বলছিলুম স্থূলতা রোগটি অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্বচ্ছল, পরিশ্রমবিমুখ সমাজের রোগ। অফিসার বা উচ্চ বেতনভোগী কর্মচারী, স্বচ্ছল ব্যবসায়ী ও পরপিণ্ডভোজী রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে এই ব্যাধির প্রকোপ বেশী করে দেখা যায়।

মনে রাখা দরকার, মানবদেহে সঞ্চিত মেদ তার কর্মশক্তির নিদ্রিত অবস্থা মাত্র। উপবাস ও পরিশ্রমে ওই মেদই দগ্ধ হয়ে প্রাণশক্তি বা কর্মশক্তিতে রূপান্তরিত হয়ে যায়। তাই যারা শারীরিক পরিশ্রম কম করে, মেদ তাদের শত্রুর রূপ ধারণ করে ও অপমৃত্যুর কারণ হয়। এই মেদ তলপেটে জমে নারীর বন্ধ্যাত্ব ও পুরুষের যৌন অক্ষমতার কারণ হয়। তাই স্থূলকায় ব্যষ্টিরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে নিঃসন্তান হয়। বক্ষে ও উদরে অতিরিক্ত মেদ জমে বায়ুর আক্ষেপ সৃষ্টি হয় ও তার ফলে যকৃৎ যতদিন না আক্রান্ত হয় ততদিন মেদরোগীর থাকে রাক্ষুসে ক্ষুধা, নিমন্ত্রণ ৰাড়ীতে তারাই হয় নামী নামী ঔদরিক! আর লক্ষণীয় বিষয় এই

যে যে সকল খাদ্যে মেদ বৃদ্ধি পায় সেই সকল খাদ্যের দিকেই এদের লোভ থাকে বেশী অর্থাৎ যজ্ঞবাড়ীতে গিয়ে এরা ভুলেও তরিতরকারী বেশী খায় না, বেশী খায় লুচি, মাছ, মাংস ও মিষ্টান্ন। পরে যৌবনের শেষের দিকে যকৃৎ যখন দুর্বল হয়ে পড়ে এদের ঔদরিকতারও নিবৃত্তি ঘটে। লোকের কাছে এরা তখন দুঃখ করে বলে, "আরে ভাই, তেমন খেতে পারি না"। শরীরের মাংসপেশী তখন শিথিল হয়ে ঝুলে পড়ে। অম্লরোগ, কোষ্ঠকাঠিন্য বা কোন আন্ত্রিকরোগ রোগীর দেহে ফুটে উঠে। মেদ বক্ষস্থলে অধিক পরিমাণে সৃষ্ট হয়ে হৃত্পিণ্ড ও ফুসফুসের কার্যধারা ব্যাহত হয়, রোগী শ্বাস-প্রশ্বাসে কষ্ট অনুভব করে, অল্প পরিশ্রমে ক্লান্ত হয়ে পড়ে, হাঁসফাঁস করে, ঘর্মাক্ত কলেবরে বসে পড়ে। রক্তবহা নাড়ীর মধ্যে এই মেদ জমলে রক্তচাপ বৃদ্ধি রোগ দেখা দেয়। পরিণাম স্বরূপ, হৃদপিণ্ডের চাপে শিরা ছিঁড়ে মস্তিষ্কের বা দেহের অন্য স্থানে আভ্যন্তরীণ রক্তক্ষরণের ফলে রোগীর মৃত্যু হয় বা পক্ষৰধ রোগ দেখা দেয়।

অতিরিক্ত স্থূলতার দরুণ প্রাণবায়ু বা যকৃতের কাজে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়, কোষ্ঠবদ্ধতা, ধাতুরোগ, ঋতুরোগ ও নানান ধরণের আন্ত্রিক রোগ সৃষ্টি হয়।

চিকিৎসা:

প্রথম পর্যায়ে:

প্রত্যুষে: উৎক্ষেপমুদ্রা, দীর্ঘপ্রণাম, যোগমুদ্রা, ভুজঙ্গাসন। সন্ধ্যায়: ভুজঙ্গাসন, পশ্চিমোত্তানাসন ও শলভাসন।

প্রথম পর্যায়ের আসন-মুদ্রাগুলি কতকটা অভ্যস্ত হয়ে যাবার পরে দ্বিতীয় পর্যায় শুরু হবে।

দ্বিতীয় পর্যায়ে:

প্রত্যুষে: উৎক্ষেপমুদ্রা, দীর্ঘপ্রণাম, যোগমুদ্রা, ভুজঙ্গাসন,

পদহস্তাসন।

সন্ধ্যায়: মৎস্যমুদ্রা, নৌকাসন, মৎস্যেন্দ্রাসন।

পশ্চিমোত্তানাসন ও

দ্বিতীয় পর্যায়ের আসন-মুদ্রাগুলি কতকটা অভ্যস্ত হয়ে যাবার পরে তৃতীয় পর্যায় শুরু হবে।

তৃতীয় পর্যায়ে:

প্রত্যুষে: উৎক্ষেপমুদ্রা, দীর্ঘপ্রাণায়াম, ভুজঙ্গাসন, কর্মাসন, গরুড় মুদ্রা।

সন্ধ্যায়: নৌকাসন, পশ্চিমোত্তানাসন, মৎস্যেন্দ্রাসন ও কুর্মকাসন।

পথ্য: অনেকে মেদরোগীর আহার কমিয়ে দেবার পক্ষপাতী, ভাবেন তাতেই বুঝি রোগীর মেদমুক্তি হয়ে যাবে। এ ধারণা ঠিক নয় কারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায় আহার কমাবার ফলে রোগী দুর্বল হয়ে পড়ে; এমনকি তারা উঠবার, হাঁটবার শক্তি হারিয়ে ফেলে। রোগীর জন্যে প্রয়োজন সুনির্বাচিত সাদাসিধে খাদ্য যেমন-

১) জল যথেষ্ট পরিমাণে পান করা যেতে পারে (আন্দাজ ৪/৫ সের, তবে এক সঙ্গে অধিক নয়) কিন্তু সম্ভবমত সর্ব ক্ষেত্রে ওই জলের সঙ্গে নেবুর রস মিশিয়ে নিতে হবে।

২) আমিষ খাদ্য, ঘৃত ও তৈলজাতীয় খাদ্য সম্পূর্ণরূপে ৰন্ধ করতে হবে। কেবল পাতলা দুধ একটু একটু করে অনেক বারে গোটা দিনে তিন পোয়া/এক সের পান করা যেতে পারে।

৩) রোগীর ক্ষুধা অনুযায়ী সব রকমের ফলই যথেষ্ট পরিমাণে ব্যবহার করা যেতে পারে, বিশেষ করে রসাল টক ফল রোগীর পক্ষে অত্যন্ত হিতকর।

৪) ভাত-রুটি-ডালের মাত্রা কমিয়ে বা ৰন্ধ করে সবুজ তরিতরকারী ও ঝোলের পরিমাণ বাড়াতে হবে।

৫) চীনী বা গুড়ের ব্যবহার কমিয়ে অল্প পরিমাণে মধু ব্যবহার করা যেতে পারে। মধুও দৈনিক তিন চামচের অধিক নয়।

বিধি-নিষেধ: উপবাস-বিধি, আতপস্নান-বিধি রোগীকে মেনে চলতে হবে। সাধারণতঃ এটি পরিশ্রমবিমুখ ও ভোজনবিলাসীদের রোগ। তাই যত দূর সম্ভব সাদাসিদে ভোজ্য গ্রহণ করতে হবে। লুচি, পুরীর পরিবর্তে শুষ্ক রুটি খেতে হবে ও বসে বসে ফরমাইস করার অভ্যাস ত্যাগ করে হাতে-পায়ে গায়ে-গতরে পরিশ্রম করতে হবে।

সূচীপত্র

# হৃদরোগ (Heart disease)

লক্ষণ: বুকের মধ্যে জোর শব্দ হওয়া, বুকে ব্যথা, নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট ৰোধ হওয়া, হাত-পা থর থর করে কাঁপা প্রভৃতি।

কারণ: হৃদরোগের পেছনে অজস্র কারণ থাকতে পারে।

১) পাকস্থলীকে যাঁরা সব সময় খুব বেশী ভারাক্রান্ত করে রাখেন, তাঁদের পাকস্থলীতে অধিক পরিমাণে রক্ত সঞ্চালনের আবশ্যকতা দেখা দেয় ও ওই রক্ত যুগিয়ে চলবার জন্যে হৃদ্যন্ত্রকে অত্যধিক পরিশ্রম করতে হয়, যার ফলে তা' দুর্বল হয়ে পড়ে।

২) ৩৫/৪০ বৎসর বয়সের পরেও যাঁরা লোভের বশে অত্যধিক আমিষ খাদ্য গ্রহণ করে থাকেন তাঁদের হৃদ্রোগ দেখা দিতে পারে কারণ আমিষ খাদ্য রক্তে অম্লভাগ বাড়িয়ে দেয় ও সেই রক্তকে দোষমুক্ত করবার জন্যে হৃদ্যন্ত্রকে অত্যধিক পরিশ্রম করে দুর্বল হয়ে পড়তে হয়। রক্তে অম্লদোষ বেড়ে গেলে দেহাভ্যন্তরস্থ যন্ত্রগুলিও ক্রমশঃ দুর্বল হয়ে পড়ে ও তারা হৃদ্যন্ত্রের দুর্বলতার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

৩) অত্যধিক তৈল বা চর্বি জাতীয় খাদ্যগ্রহণ ও তদুপযুক্ত শারীরিক পরিশ্রম না করার ফলে স্নায়ুপুঞ্জ চর্বিপ্রধান হয়ে যায় ও তাদের পক্ষে হৃদ্যন্ত্রকে যথাযথ ভাবে সাহায্য করা অসম্ভব হয়ে পড়ে, ফলস্বরূপ হৃদ্যন্ত্র দুর্বল হয়ে পড়ে। ওই চর্বি স্নায়ু-ধমনীর অভ্যন্তরে জমতে থাকলে রক্ত চলাচল ব্যবস্থা শোচনীয়ভাবে বাধাপ্রাপ্ত হয় ও রক্তসঞ্চালন ক্রিয়া যথাযথভাবে চালু রাখবার জন্যে হৃদ্যন্ত্রকে খুব  বেশী পরিশ্রম করতে হয় যার ফলে অল্প কালের মধ্যেই সে দুর্বল হয়ে পড়ে।

৪) যকৃতের দুর্বলতার ফলেও অনেক সময় দেহের উদ্বৃত্ত চর্বি স্নায়ু-ধমনীর অভ্যন্তরে সঞ্চিত হবার সুযোগ পায় ও স্বাভাবিক নিয়মে হৃদ্যন্ত্র দুর্বল হয়ে যায় (এই ধরণের রোগীর সাধারণতঃ পুরাতন আমাশয় রোগ থাকে)।

৫) অল্প ক্ষুধায় বা অক্ষুধায় এক সঙ্গে অতিরিক্ত খাদ্য গ্রহণও এই রোগের একটি কারণ, কেননা এক সঙ্গে খুব বেশী খাদ্য গ্রহণ করলে পাকস্থলীর আকার বড় হয় ও তা' উর্ধ্বস্থ হৃদ্যন্ত্রের উপর চাপ দিতে থাকে। যে সকল ব্যষ্টি নিয়মিত রূপে জলখাবার খান না, সাধারণতঃ তাঁরা দ্বিপ্রাহরিক ও রাত্রির আহারের সময় অধিক খাদ্য গ্রহণ করেন। দিনের পর দিন এই অবস্থা চলতে থাকলে তাঁদের পাকস্থলীর আকার বড় হয়ে যায় ও হৃদ্রোগ দেখা দেয়।

৬) কোষ্ঠকাঠিন্য এই রোগের আরেকটি কারণ। কোষ্ঠ পরিষ্কার না হলে সঞ্চিত মল দেহাভ্যন্তরে পচতে থাকে ও তার ফলে দূষিত

বীজাণু সৃষ্ট হয়। এই বীজাণু হৃদ্যন্ত্রকে আক্রমণ করবার সুযোগ পেলে হৃদ্রোগ ফুটে ওঠে।

৭) যারা অতিরিক্ত ক্রোধী তাদেরও এই রোগে আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা থাকে কারণ ক্রোধের সময় মুখে ও মাথায় হঠাৎ অতিরিক্ত রক্ত সঞ্চালনের প্রয়োজন দেখা দেয় (যার ফলে মুখ লাল হয়ে যায়)। এই অতিরিক্ত রক্ত সঞ্চালনের জন্যে হৃদ্যন্ত্রকে হঠাৎ অত্যন্ত পরিশ্রম করতে হয়। তাই যারা স্বভাবগত ভাবে ক্রোধী তাদের হৃদ্যন্ত্র দুর্বল হয়ে পড়ে। একই কারণে অতিরিক্ত লজ্জাতেও হৃদ্যন্ত্র দুর্বল হয়ে যাবার সম্ভাবনা থাকে।

৮) অতিরিক্ত ভয়ে শরীরের বিভিন্ন অংশ থেকে রক্ত সরে যায় ও সেই সমস্ত রক্ত হঠাৎ বিপুল পরিমাণে হৃদ্যন্ত্রের কাছে গিয়ে জমা হয়। এই চাপ হৃদ্যন্ত্রের পক্ষে সহ্য করা কষ্টকর। তাই অতি ভয়ে হৃদ্যন্ত্র, ঢিপঢিপ বা ধড়ফড় তো করেই থাকে, অনেক সময় অতিক্রিয়তার ফলে তার ক্রিয়া বন্ধ হয়ে গিয়ে মৃত্যুও ঘটতে পারে। এইরূপ কাল্পনিক ভূতের ভয়ে অনেক সময় হৃদ্যন্ত্রের ক্রিয়া

বন্ধ হয়ে মৃত্যু হতেও দেখা যায়। মৃত্যুর ঠিক পূর্ব ক্ষণে অথবা কিছু পরে কখনও কখনও ওই রক্ত মুখ দিয়ে বহির্গত হয়ে যায় (লোকে ভাবে ভূত মেরে ফেলেছে)। তাই দেখা যায় ভীরু স্বভাবের লোকেরা প্রায়শঃ হৃদ্রোগে আক্রান্ত হন।

৯) ঠিক একই কারণে কামেন্দ্রিয়ের ব্যবহারও হৃদ্যন্ত্রকে অতিক্রিয় করে থাকে ও শ্বাসক্রিয়াকে দীর্ঘায়ত করে দেয়। তাই যারা স্বভাবগতভাবে কামুক তারাও প্রায়ই হৃদ্রোগে আক্রান্ত হয়। যুবকদের অতিরিক্ত শুক্রস্খলনের ফলেও তাই হৃদ্রোগ দেখা যায়।

১০) মদ, তামাক, বিড়ি, সিগারেট বা অন্যান্য নেশার জিনিস অত্যধিক পরিমাণে ব্যবহার করলে কোষ্ঠকাঠিন্য রোগের উদ্ভব হয় যা হৃদ্রোগ সৃষ্টির অন্যতম কারণ। তা'ছাড়া ওই সকল নেশার জিনিস রক্তে অম্ল ভাগ বাড়িয়ে দেয়, দেহের গ্রন্থিসমূহকে দুর্বল করে দেয় ও শেষ পর্যন্ত হৃদ্যন্ত্রও এই গ্রন্থিসমূহের সক্রিয় সহযোগিতা থেকে বঞ্চিত হয়ে রোগগ্রস্ত হয়ে যায়।

১১) কোন জীবনীক্ষয়ী রোগে বা চিররোগে (chronic disease) অধিক দিন ভুগে রক্ত দুর্বল হয়ে পড়লে সেই রক্তের পুনরুজ্জীবনের জন্যে হৃদ্যন্ত্রকে খুব বেশী পরিশ্রম করতে হয় বলে তা ক্রমশঃ দুর্বল হয়ে যায়। তাই দেখা যায় বেরিবেরি, নিউমোনিয়া, যক্ষ্মা, মধুমেহ, প্রমেহ, উপদংশ বা স্ত্রীব্যাধিতে মানুষ যত বেশী দিন ধরে ভুগতে থাকে হৃদ্যন্ত্রও ততই দুর্বল হতে থাকে ও এই হৃদ্যন্ত্রের চরম দুর্বল মুহূর্তে তার ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যায় ও রোগীর মৃত্যু ঘটে।

চিকিৎসা:

প্রত্যূষে: উৎক্ষেপ মুদ্রা (অধিক জল পান করা চলবে না)

যোগমুদ্রা, দীর্ঘপ্রণাম, ভুজঙ্গাসন, বায়বী মুদ্রা বা বায়বী প্রাণায়াম।

সন্ধ্যায়: যোগমুদ্রা, দীর্ঘপ্রণাম, ভুজঙ্গাসন, পদহস্তাসন, বায়বী মুদ্রা বা বায়বী প্রাণায়াম।

মনে রাখতে হবে রোগের বাড়াবাড়ি অবস্থায় এক মাত্র উৎক্ষেপ মুদ্রা ব্যতিরেকে আর কোন আসন, মুদ্রা করা চলবে না। রোগের প্রকোপ কিছুটা কমে যাবার পরেই তাই আসন, মুদ্রাগুলির অনুশীলন করতে হবে। রোগী মোটামুটি বিচারে সুস্থ হয়ে যাবার পরে পদহস্তাসনের পরিবর্তে কর্মাসন অভ্যাস করতে হবে। ব্যাপক স্নানবিধিও রোগীকে বিশেষভাবে সাহায্য করে থাকে।

পথ্য: দুধ ও ফল এই রোগের এক মাত্র খাদ্য ও পানীয়। সকাল-

বিকালের জলখাবার দুধ ও ফলেই সম্পন্ন করতে হবে। দ্বিপ্রহরেও

কোষ্ঠপরিষ্কারক ও লঘুপাচ্য খাদ্য খুৰ অল্প পরিমাণে গ্রহণ করতে হবে।

ভাত বা রুটি বর্জন করতে পারলেই ভাল, অন্যথায় অল্প পরিমাণ সিদ্ধ

চালের ভাত খাওয়া যেতে পারে। রাত্রির আহার্যে দুধ ও ফল ছাড়া আর

কিছুই না থাকা উচিত। সূর্যাস্তের পর রোগী যেন কলা না খায়। দুধ

যাদের সহ্য হয় না বা অন্য যে কোন কারণে দুধ সংগ্রহ করতে পারে

না তারা দুধের পরিবর্তে ঘোল ব্যবহার করতে পারে। পাতে খাবার

জন্যে লবণ ব্যবহার করা রোগীর পক্ষে ক্ষতিকর। আহারান্তে কিছু

সময় দক্ষিণ নাসায় শ্বাস প্রবাহিত রাখতে হবে।

বিধিনিষেধ: পাকস্থলীকে পরিষ্কার রাখা, রক্তের ক্ষার ভাগ ৰাড়ানো ও হৃদ্যন্ত্রকে অতিরিক্ত পরিশ্রমের হাত থেকে রক্ষা করাই রোগীর প্রধান কর্তব্য। তাই রোগীর পক্ষে সম্পূর্ণ বিশ্রাম করাই উচিত। এমনকি মল-মূত্র ত্যাগ করার জন্যেও শয্যা ত্যাগ করা উচিত নয়। রোগীর কখনই এক সঙ্গে অধিক পরিমাণে খাদ্য গ্রহণ করা উচিত নয়। অর্থাৎ অল্প অল্প করে অনেকবার খাওয়া উচিত। রোগের বাড়াবাড়ি

অবস্থায় কেবলমাত্র দুধ, ফলের রস (বিশেষ করে কমলা ও টমেটোর রস), দুধ-মধু বা জল-মধু, পালং, কলমী, বেতো, পুনর্নবা, শুশুনি বা শুল্ফা শাকের কাথ ব্যতিরেকে আর কোন কিছুই খাওয়া উচিত নয়। পিপাসার সময় অল্প নেবুর রস মিশ্রিত জলই পান করা উচিত। দিবানিদ্রা, রাত্রি-জাগরণ, লোভের বশে উদর পূর্ণ করে খাওয়ার অভ্যাস রোগীর পক্ষে অত্যন্ত মারাত্মক। ভোজবাড়ীতে সাধারণতঃ গুরুভোজন হয়ে থাকে। তাই ভোজবাড়ীতে না খাওয়াই উচিত। রোগীর রাত্রি ৮টা/৮.৩০

মিনিটের মধ্যেই শয়ন করা উচিত। মনে রাখা উচিত অল্প পরিমাণে পালং, বেতো, কল্মী, শুল্ফা, শুশুনি বা পুনর্নবা শাক এই রোগে অত্যন্ত হিতকর। বড় এলাচও রোগমুক্তিতে বিশেষভাবে সাহায্য করে থাকে। এই রোগীর কোষ্ঠ পরিষ্কারের দিকে অত্যন্ত নজর দিতে হবে। রোগীর অন্ততঃ ৯ ঘন্টা নিদ্রা যাওয়া প্রয়োজন। ক্রোধ ও কাম রিপু থেকে মনকে সর্বদা দূরে সরিয়ে রাখতে হবে। শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রম, অতিকথন ও মৈথুন কঠোরভাবে পরিত্যজ্য।

কয়েকটি ব্যবস্থা:

১) প্রত্যহ সকালে ও শয়নকালে মধু সহ এক চামচ ৰড় এলাচের গুঁড়া (খোসা সহ গুঁড়া) সেবন করলে ভাল ফল পাওয়া যায়।

২) শুল্ফা শাকের ক্বাথ মধু মিশিয়ে পান করলে হৃদ্রোগে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়।

৩) দারুচীনী-চূর্ণ এক চামচ কিঞ্চিৎ মধু সহ দু'বেলা সেবন করলে এই রোগে ভাল ফল পাওয়া যায়।

৪) ভূমিকুষ্মাণ্ড-চূর্ণ এক আনা কিঞ্চিৎ মধু সহ দুই বেলা সেব্য।

সূচীপত্র

# পরিশিষ্টাংশ

**(ক) জলপান বিধি**:

"আপশ্চ বিশ্বভেষজী" অর্থাৎ জল সর্ব রোগের ঔষধ। বাস্তবিক পক্ষে যথাযথ ভাবে ব্যবহার করতে পারলে এক জলের সাহায্যেই সকল রোগ দূর হ'তে পারে। মনুষ্য দেহের আভ্যন্তরীণ কার্যধারা অব্যাহত রাখবার জন্যে তথা তরলতা রক্ষার জন্যে প্রত্যেকেরই প্রত্যহ যথেষ্ট পরিমাণে জল পান করা উচিত। সুস্থ মানুষ প্রত্যহ

৩/৪ সের, অসুস্থ মানুষ ৪/৫ সের ও চর্ম রোগগ্রস্ত ব্যষ্টি ৫/৬ সের জল পান করতে পারে। এই জল রোগ নিবারণে খুব বেশী সাহায্য করে থাকে।

জলের সঙ্গে অল্প নেবুর রস ও তৎসহ সামান্য পরিমাণে লবণ ব্যবহার করলে আরও ভাল হয়। জল পান করা ভাল, কিন্তু এক সঙ্গে অনেকটা জল পান করা ক্ষতিকর, বিশেষ করে হৃদরোগীর পক্ষে তা' অত্যন্ত ক্ষতিকর।

## (খ) যৌন জীবন:

লক্ষণ: অসংযমের দ্বারা যৌন জীবনকে কলুষিত করা উচিত

নয়। সকলেরই মনে রাখা উচিত দেহের সার ধাতু শুক্র, আর তার অভাবে বা বিকৃতিতে সকল ধাতুই বিকৃত হতে পারে ও দেহ যে কোন রোগে আক্রান্ত হতে পারে। মাসে চার বারের অধিক যৌন সংসর্গের ফলে শুক্র ধাতুর অপচয় হয় ও পরিণাম স্বরূপ

মস্তিষ্কের স্নায়ুকোষ, স্নায়ুতন্তু, গ্রন্থি প্রভৃতি সব কিছুই দুর্বল হয়ে পড়ে। এই অপরিমিত শুক্রক্ষয়ের ফলে শারীরিক দুর্বলতা কিছুটা দেরীতে দেখা দেয় কিন্তু মানসিক বা আধ্যাত্মিক অধোগতি সঙ্গে সঙ্গেই উপলব্ধি করা যায়। তাই কিশোর-কিশোরী বা তরুণ-তরুণীদের মধ্যে যৌন জ্ঞানের অভাব থাকা মোটেই বাঞ্ছনীয় নয়। যেখানে সংযম-অসংযমের প্রশ্ন সেখানে চার দিনই বা কেন, সংযম যত বেশী মেনে চলা যায় ততই মঙ্গল।

## স্বাধ্যায়

### (গ) মৃত্তিকা প্রলেপ :

মৃত্তিকার মধ্যেও অপরিসীম রোগ-নিবারণী শক্তি আছে। কাটা, খোঁচা, ঘা, ফোঁড়া প্রভৃতিতে যথাযথ ভাবে মৃত্তিকা-প্রলেপ দিতে পারলে রোগ-নিরাময় তথা বিষ-নিষ্কাশনে বিশেষ সাহায্য পাওয়া যায়। মৃত্তিকা প্রলেপ দেবার পর চড়চড় বোধ করতে থাকলে মৃত্তিকা শুকিয়ে যাবার ঘন্টা তিনেক পরে অথবা মৃত্তিকা বাসি হয়ে গেলে তা' ফেলে দিয়ে উত্তম রূপে যে কোন বিষনিরোধক

বস্তুর সাহায্যে ক্ষতস্থান ধুয়ে ও ক্ষতস্থানে আতপস্নান করিয়ে পুনরায় নূতন মৃত্তিকা ব্যবহার করতে হবে।

সুস্থ ব্যষ্টি বা চর্মরোগী স্নানের পূর্বে সর্বাঙ্গে হরিদ্রাবর্ণের মৃত্তিকা প্রলেপ দিয়ে ও তৎপরে মর্দন করে নদী বা পুষ্করিণীতে অবগাহন স্নান করলে অবশ্যই উত্তম ফল পেয়ে থাকে। স্নানকালে মধ্যে মধ্যে এই ভাবে মৃত্তিকা মর্দন করা প্রত্যেকের পক্ষে বাঞ্ছনীয়। কুষ্ঠ, গরল প্রভৃতি দূষিত ক্ষত রোগে যাঁরা ভুগছেন তাঁদের পক্ষে এই ভাবে মৃত্তিকা মর্দন করণান্তে স্নান প্রত্যহ অবশ্য করণীয়।

**(ঘ) আতপস্নানঃ**

আতপস্নানের অর্থ রোদ পোহানো। সূর্যের তেজ সকল দেশে ও সকল ঋতুতে সমান নয়। তাই আতপ স্নানের বিহিত সময়ও নির্ধারণ

করে দেওয়া সম্ভব নয়। তবে বর্তমান কালে বিহারের সমতল ভূমিতে গ্রীষ্মকালে সকাল দশটা পর্যন্ত ও শীতকালে দুপুর দু'টো পর্যন্ত আতপস্নান করা যেতে পারে।

স্নানকালে রোগগ্রস্ত অঙ্গটি রোদে রেখে শরীরের অবশিষ্টাংশ ছায়ায় রাখা উচিত। একটানা ১৫/২০ মিনিট রোদে রাখার পরে রোগগ্রস্ত অংশটি উত্তপ্ত হয়ে উঠলে সেটিকে ছায়ায় আনা উচিত ও নিম্নলিখিত পদ্ধতি অনুসরণ করা উচিত:

১) রোগগ্রস্ত অঙ্গ বাত রোগযুক্ত হ'লে তাতে পরামর্শ মত তৈল ৪/৫ মিনিট উত্তম রূপে মর্দন করে-

২) রোগগ্রস্ত অঙ্গ চর্মরোগগ্রস্ত হলে তা'তে নিম তৈল ৪/৫ মিনিট উত্তম রূপে মর্দন করে-

৩) রোগগ্রস্ত অঙ্গ অন্য কোন ব্যাধিগ্রস্ত হলে তা'তে ভিজে (ঠাণ্ডা) গামছা বা তোয়ালে নিঙড়ে তার দ্বারা মুছে নিয়ে ওই অঙ্গটির উত্তাপ স্বাভাবিক হয়ে যাবার পরে সেটিকে পুনরায় রোদে দেওয়া যেতে পারে ও ওই ভাবে ১৫/২০ মিনিট রোদে রেখে পুনরায় পূর্বলিখিত বিধি অনুযায়ী তেল বা গামছা দ্বারা মর্দন করে ঠাণ্ডা করে নিতে হবে। এইভাবে বার বার রোদ লাগানো ও মর্দন ক্রিয়া করে নেওয়া যেতে পারে। মর্দনের শেষ বারটি কিন্তু তৈলাদি কোন কিছু মালিশ না করে চর্মরোগ বাদে সকল রোগের ক্ষেত্রেই ভিজে গামছা বা তোয়ালে দিয়ে মুছে নেওয়া বাঞ্ছনীয়।

সুস্থ ব্যষ্টি বা রোগী ইচ্ছা করলে সর্বাঙ্গে আতপস্নান করতে পারে। সে ক্ষেত্রে আতপস্নানের পর সমগ্র শরীরটাই ভিজে গামছা বা তোয়ালে দিয়ে মুছে ফেলতে হবে।

সমগ্র দেহে আতপস্নান করতে হ'লে বিনা বস্ত্রে বা যৎসামান্য বস্ত্র পরিধান করে সূর্যের দিকে পিঠ করে রোদ লাগাতে হবে। রোদ যদি শরীরের সামনের দিকে অর্থাৎ মুখ, বুক, পেট প্রভৃতি কোন স্থানে হয় সেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট অংশটুকু অনাবৃত রেখে বাকী শরীর আবৃত রাখতে হবে। মনে রাখা উচিত "আগুন খাবে পেটে রৌদ্র খাবে পিঠে" অর্থাৎ প্রয়োজন বোধে যদি কখনও আগুন পোহাও তখন আগুনকে পেটের দিকে রাখতে হবে, পিঠের দিকে নয়।

সূচীপত্র

**(ঙ) বায়ু সেবন:**

বিশুদ্ধ বায়ুর মধ্যেও রোগ দূরীকরণের শক্তি রয়েছে। বায়ু সেবনকালে যত দূর সম্ভব পূর্ণভাবে শ্বাস গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয়, কারণ তা'তে করে ব্যাপক ভাবে বায়ু ফুসফুসের মধ্যে প্রবিষ্ট হবার সুযোগ পায়। বায়ু সেবন গাড়ীতে চড়ে না করে পায়ে

হেঁটে করা উচিত। শরীর থেকে যথেষ্ট পরিমাণ ঘর্ম নির্গত না হলে বুঝতে হবে বায়ু সেবন যথাযথ ভাবে করা হয় নি।

**(চ) উপবাস বিধি:**

উপবাস কালে দেহযন্ত্র যথেষ্ট পরিমাণ বিশ্রাম পায় ও তার ফলে দ্রুত রোগারোগ্য হয়ে থাকে। দীর্ঘ উপবাস ও তৎসহ যথেষ্ট পরিমাণে নেবুর রস সহ জল পান করলে দুরারোগ্য চর্মরোগ থেকেও পরিত্রাণ পাওয়া সম্ভব।

যাদের স্বাস্থ্য খুবই ভাল, শরীরে শক্তিও যথেষ্ট, তারা ব্যতিরেকে আর কারো নিরম্বু উপবাস করা উচিত নয়। অশ্মরী রোগগ্রস্ত ব্যষ্টির পক্ষে নিরম্বু উপবাস কঠোর ভাবে নিষিদ্ধ।

রোগী ও সাধারণ সুস্থ ব্যষ্টির পক্ষে যথেষ্ট নেবুর রস সহ স-অম্বু উপবাস বাঞ্ছনীয়।

যারা অত্যন্ত দুর্বল তারা উপবাসকালে অল্প পরিমাণে ফল ও দুগ্ধ গ্রহণ করতে পারে।

পরিশিষ্টাংশ

যে কোন কারণেই হোক যারা একাদশী, পূর্ণিমা, অমাবস্যা প্রভৃতি তিথিতে উপবাস করে না তাদের পক্ষে ওই তিথিতে ভাত, শাক-ভাজা, ডাল ও আমিষ খাদ্য বর্জন করা উচিত আর পূর্ণিমা ও অমাবস্যার রাত্রে অল্প পরিমাণে দুধ, ফল বা শুকনো জিনিস খেয়ে থাকা উচিত অর্থাৎ নিশিপালন করা উচিত।

**(ছ) মানসিক শুচিতা:**

মানসিক শুচিতা শারীরিক সুস্থতা রক্ষায় বিশেষ ভাবে সাহায্য করে। অশুচি চিন্তা রক্তে অল্প ভাগ বাড়িয়ে দেয় ও উদর রোগ, হৃদ্রোগ ও মস্তিষ্কের রোগ সৃষ্টি করে। তাই প্রতিটি মানুষেরই উচিত যত দূর সম্ভব নিঃস্বার্থ সেবামূলক কাজ ও ঈশ্বর প্রণিধানে নিজেকে রত রাখা। মানসিক শুচিতা অর্জনের সর্বশ্রেষ্ঠ পদ্ধতি হচ্ছে যম ও নিয়ম বিধির (যম ও নিয়মের বিস্তৃত ব্যাখ্যার জন্যে "জীবনবেদ" পুস্তকখানি দ্রষ্টব্য) অনুশীলন করা।

**(জ) যম সাধন:**

যম পাঁচ প্রকার: (১) অহিংসা, (২) সত্য, (৩) অস্তেয়, (৪) , ব্রহ্মচর্য ও (৫) অপরিগ্রহ।

১) **অহিংসা** : "মনোবাক্কায়ৈঃ- সর্বভূতানাং অপীড়নং অহিংসা”  অর্থাৎ মন, বাক্য ও শরীরের দ্বারা জগতের কোন প্রাণীকে পীড়ন না করার নাম অহিংসা।

২) **সত্য**: "পরহিতার্থং বাঙ্ঙনসো যথার্থত্বং সত্যম্”  অর্থাৎ অপরের হিতের উদ্দেশ্যে মন ও বাক্যের যে যথার্থ ভাব তা-ই সত্য।

৩) **অস্তেয়**: “পরদ্রব্যাপহরণত্যাগোহস্তেয়ম্”  অর্থাৎ অপরের দ্রব্য গ্রহণের ইচ্ছা ত্যাগ করার নাম অস্তেয়। অস্তেয় অর্থে অচৌর্য্য- চুরি না করা।

৪) **ব্রহ্মচর্য:** "ব্রহ্মণি বিচরণং ব্রহ্মচর্যম্" অর্থাৎ মনকে সর্বদা ব্রহ্মে রত রাখার নাম ব্রহ্মচর্য।

৫) **অপরিগ্রহ :** “দেহরক্ষাতিরিক্তভোগসাধনাহস্বীকারোহ-পরিগ্রহঃ” অর্থাৎ দেহরক্ষার নিমিত্ত যা' প্রয়োজনীয় তদতিরিক্ত সব কিছুই ত্যাগ করার নাম অপরিগ্রহ।

**(ঝ) নিয়ম সাধন:**

নিয়ম পাঁচ প্রকার: (১) শৌচ, (২) সন্তোষ, (৩) তপঃ, (৪) স্বাধ্যায় ও (৫) ঈশ্বর-প্রণিধান।

১) **শৌচ:** শৌচ মানে পরিচ্ছন্নতা। পরিচ্ছন্নতা দুই প্রকারের- শারীরিক পরিচ্ছন্নতা ও মানসিক পরিচ্ছন্নতা। মানসিক পরিচ্ছন্নতার উপায়- জীবে দয়া, দান, পরোপকার ও কর্তব্যে নিরত থাকা।

২) **সন্তোষ**: অযাচিত ভাবে যা' পাওয়া যায় তাতেই তৃপ্ত থাকার নাম সন্তোষ। সর্বদা মনকে প্রফুল্ল রাখার চেষ্টা করা দরকার।

৩) **তপঃ**ঃ উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে শারীরিক কৃচ্ছ্রু সাধনের নাম তপঃ। উপবাস, গুরুসেবা, জনক-জননীর সেবা তপের অন্যতম অঙ্গ। ছাত্রের পক্ষে অধ্যয়নই তপের প্রধান অঙ্গ- "ছাত্রাণাম্ অধ্যয়নং তপঃ।"

৪) **স্বাধ্যায়**: অর্থ বুঝে শাস্ত্রগ্রন্থ পাঠের নাম স্বাধ্যায়। সৎ সঙ্গেও স্বাধ্যায়ের কাজ হয়। নিয়মিত ধর্মচক্রে উপস্থিত থাকলে শ্রেষ্ঠ স্বাধ্যায় সাধন হয়।

৫) **ঈশ্বরপ্রণিধান :** সুখে-দুঃখে, সম্পদে-বিপদে ঈশ্বরে দৃঢ় বিশ্বাস রাখা ও জাগতিক সমস্ত ব্যাপারে নিজেকে যন্ত্রী (machine- man) মনে না করে যন্ত্র মনে করে চলা।

মানব জীবন অল্পমেয়াদী। সাধনা সম্পর্কিত শিক্ষা তাড়াতাড়ি সম্পূর্ণ করে নেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ

সূচীপত্র

## সমাপ্ত

**********X**********

# ঘোষণা

আধ্যাত্মিক সাধনা তথা পথনির্দেশনা লাভ করার সুযোগ ও অধিকার নারী – পুরুষ, জাত পাত, ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সকলেরই সমান হওয়া উচিত। এই সাধনা বিজ্ঞান পরমার্থের সন্ধান দেয় । যা পরমার্থের সন্ধান দেয় তা কখনোই অর্থকারী

ব্যবসায় লাগানো উচিত না। আনন্দমার্গের সন্ন্যাসী / সন্ন্যাসীনীদের কাছ থেকে যে কোন মানুষ এই সাধনা বিজ্ঞান বিনামূল্যে অনায়াসে শিখতে পারেন।

সাধনা হলো মানস-আধ্যাত্মিক অনুশীলন। বেয়াম হল শারীরিক অনুশীলন। যদি কেউ ব্যায়াম শিখে তা অনুশীলন না করে তাহলে তার কিছুই লাভ হয় না। ঠিক তেমনি সাধনা শিখে যদি কেউ তা নিয়মিত অনুশীলন না করে তবে তার কিছুই লাভ হবে না।

মানব জীবনের পরম লক্ষ্য হল অনন্ত সুখ তথা আনন্দ লাভ করা। সাধনা'ই হলো একমাত্র উপায় যার দ্বারা এই লক্ষ্যে পৌঁছানো যায়।